কবিতায় ধর্মীয় বহু অন্তর্নিহিত তথ্য বিধৃত

ভবপাড় যাবার চিন্তা, রাখতে হবে মনে (১)

শ্রী অনিল মোহন কর

মন বলি কোথা যাবি গুরুর কৃপা না হলে পরে

কোথাও গিয়ে শান্তি পাবিনে রে মন।

একবার ভাব গুরুর কৃপা কেমনি পাবি ও মন রে

ভাব ভাব মন রে ভেবে স্থির কর মনটি।

ও কৃপা না হলে ভবে যাবি কেমনি সেই স্থানে

যে স্থানটি ইহলোক পরলোকের শান্তি।

ও মন রে, কি ভাবে কি করবি, স্থির করতে হবে

আগে, ভেবে চিন্তে যাহা করবে, করতে হবে ভবে।

ভবপারের চিন্তা কর আগে নইলে পস্তাবে মৃত্যুর পরে

তাই তো বলি মন, স্থির কর, স্থির কর ভবনদী হতে পার।

দক্ষিণেশ্বরের রসের রসিক (২)

শ্রী অনিল মোহন কর

ও রসের রসিক তুমি কৈ গেলা রে, আমি

হণ্য হয়ে খুঁজছি তোমায় ও রসিক রে।

দক্ষিণেশ্বর গিয়ে দেখি তুমি নেই সেখানে

দেখি তথায়, মা কালী দাঁড়িয়ে শিবের উপরে।

লোল জিহ্বা বের করে রূপের বাহার গায়ে রয়েছে

তুমি নেই সেথায়, মা আছেন আপন ধারাতে।

বেলুড় মঠে গিয়ে দেখি তুমি রয়েছ

সেথায়, অন্র দিয়ে তোমায় জানে যারা,

তাঁদের দান করছ আশীষ, ও রসিক রে

এ তোমার লীলা খেলা, বুঝবে কে রে।

শ্রীরামানুজাচায্য নরকবাসী হয়ে সকলকে বৈকুণ্ঠে প্রেরন (৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামানুজাচায্য (১০১৭-১১৩৭ খ্রীঃ) বুঝেছিলেন জগতকে বাদ দিয়ে শুধু ব্রহ্মাকে গ্রহন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “ওজনে কম পড়ে” রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে।

শ্রীঠাকুর বলছেন “ওজনের সময় শাঁস বীচি খোলা সব নিতে হবে, যারই শাঁস তারই বীচি তারই খোলা” খোলাটা যেন জগৎ, বীজগুলো যে বীচি।

বিচার করার সময় শাসকেই সার খোলা আর বীচিকে, অসার বলে বোধ হয়, বিচার হয়ে গেলে সমস্ জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়, যে অজ্ঞানে শাস, সেই সত্তা দিয়েই বীচি হয়েছে।

রামানুজ তাই ব্রহ্মের সঙ্গে জগৎকে নিলেন অর্থাৎ বিভূতিকে যা এই জীব জগৎরূপে প্রকাশ মায়া বলে তিনি জগৎ সংসারকে উড়িয়ে দিলেন না।

ব্রাহ্মন এবং পুরুষ ছাড়া জ্ঞান চর্চ্চা সন্ন্যাস বা মুক্তিমার্গে আর কাহারো অধিকার স্বীকৃত নয় তাই রামানুজের ধর্মমত সকলের জন্য, ব্রাহ্মন-অব্রাহ্মন, পুরুষ-স্ত্রীর কোন প্রভেদ নেই।

একবার রামানুজের ব্যাকুল ইচ্ছায় বৈষ্ণব আচায্য গোষ্ঠি পূর্নের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন দীক্ষার পর রামানুজের অন্র পরম আনন্দে উদাসিত হয়ে উঠল।

তাঁকে গুরু বললেন বড় জাগ্রত আর অমোঘ এই মন্ত্র, এ মন্ত্র যে পাবে সেই যাবে বৈকুণ্ঠে তাই তুমি সতর্কতার সাথে যোগ্য অধিকারীকেই এ মন্ত্র দান করবে।

কিন্তু অসদ্ব্যবহার করলে অনন্ নরকবাস একথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজ ছুটলেন তির কুষ্ঠির বিষ্ণ মন্দিরে, মন্দিরের উঁচু বাড়ান্দায় চিৎকার করে মানুষ হাজির করতে করল শুরু।

গুরু গোষ্ঠিপূর্ন এ খবর জেনে মহাক্রুদ্ধ হয়ে এসে রামানুজকে ভৎসনা ও অভিসম্পাদ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন কেন তুমি এ কাজ করলে, নতজানু ও করজোড়ে জবাব দিলেন।

প্রভু নরকবাসে আমার কোন দুঃখ নেই বরং বৈকুণ্ঠে বাস অপেক্ষা তাই আমার কাম্য আপনার আদেশে এ মন্ত্রে অবধারিত বৈকুণ্ঠেই আমি নরকবাসী হয়ে সবাই বৈকুণ্ঠবাসী হউক।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে আচন্ডালে কোল দিয়ে ধর্ম রক্ষা (৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের চিত্ত মুক্ত ঘটেছিল

সমগ্র উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ও ভাবজীবনেও তাঁর প্রভাব সদূর প্রসারী ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া"

বাঙ্গালীর চিত্তলোক মন্থন করে যে অমৃত উঠছে, চৈতন্যদেব তারই নির্যাস।

ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্য প্রভাবে ডোম-বৃন্দাবন ওভাব-বৃন্দাবনের প্রার্থক্য ঘুচে গিয়েছিল

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচায্যরূপে অভিহিত করেন।

স্বামীজীর মতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি শ্রেষ্ঠ আচায্যদের অন্যতম প্রেমোন্মত্ত যাহার কোন ছিল না সীমা

পূন্যবান, পাপী, হিন্দু, মোসলমান, পবিত্র, অপবিত্র, বেশ্যা, পতিত সকলেই পাইত তার ভালবাসা।

যদিও তৎ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের অত্যন অবনতি ঘটেছে, কাল প্রভাবে সকলেরই অবনতি হয়ে থাকে

তথাপি তাঁর সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত সমাজে সকলেরই আশ্রয় স্থল।

ঐ সময়ে ধর্ম উচ্চ বর্নের হাতে পর্যবসিত হয়ে জাতি ভেদের পাপ সমাজকে পঙ্গু করে তুলেছিল

সেই সঙ্গে আরও ছিল মুসলমান রাজপুরুষদের বল পূর্বক হিন্দুগণকে ধর্মান্তরিত করা।

আবার অন্যদিকে ধর্ম ধ্বজী হিন্দু সমাজপতিরা নিম্ন বর্ণের মানুষকে তাদের দারিদ্র ও অসহায়তার সুযোগে

জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত করে তথা কথিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান, অর্থদন্ড ও নানা নির্জাতন করত।

অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে, বাধ্য হয়ে দলে দলে ছুটে ছিল ইসলাম ধর্মের ছায়ায়, তাছাড়া হিন্দু সমাজপতিদের

ধর্মের নামে বীভৎস বামাচারের নিলর্জ্জ যৌনাচারের নির্বাক কর্দমাক্ত ধারা।

এই ঘোরতর দুর্যোগের তামসিকতাকে বিদীর্ণ করে ভারতের অবিভূত আত্ম প্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেবের

যাঁহার আগমনে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সৃষ্টি হল প্রবল আলোড়ন।

যুগাচায্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গান ও কিছু কথা (৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

গৌতমের প্রান, শঙ্করের জ্ঞান

অবতীর্ণ লয়ে ধরা পরে

রামানুজ, গোরা, এক প্রেমে জোড়া

কবীর নানক, এক ডোরে।

যত অবতার সমষ্টি সবার

রামকৃষ্ণ রূপে এইবার।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ডি. এস. শর্মা লিখছেন স্মরনাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে হৃদপিন্ড হ'ল ধর্ম, সেই ধর্মকেই ভুলতে বসেছিল ভারতবর্ষ।

ধর্মকে ভুলে গেলে, ধর্মকে বর্জন করলে ভারতবর্ষের মৃত্যু হবে অনিবার্য্য অবশ্যই কিন্তু ভারতবর্ষের কখনও মৃত্যু ঘটতে পারেনা, কারন এ হলে সমগ্র বিশ্বের চরম দুর্দিন হবে।

স্বামিজী বলছেন ভারত কি মরে যাবে তাহলে জগত হতে সমূদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হবে যা ম্যানুষকে ধারন করে, ধারন করে থাকে, যা মানুষকে রক্ষা করে তাই ধর্ম।

ধর্ম বাহিরে নহে, ধর্ম আচার অনুষ্ঠানে নয় ধর্ম জীবন ধর্ম চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে নূতন করে দেখালেন ধর্ম অনুশীলনের বস্তু, ধর্ম অনুভূতির বিষয়, ধর্ম উপলব্ধির ধন।

শ্রীঠাকুর বলেন কে উপোস করল কি করল না তীর্থে গেল কি গেলনা, গঙ্গা স্নান করল কি করল না পূজো আহ্নিক করল কি করল না তার মধ্যে ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়।

ধর্ম আরও মহৎ জিনিস আরও মহৎ ও বৃহৎ এ হল বহিরঙ্গ, এগুলো গৌন ব্যাপার আসল হল পবিত্র হওয়া, সত্যনিষ্ট, অসূয়া শূন্য, জিতেন্দ্রিয় এসব হলেনই আসল হওয়া।

শ্রীঠাকুর আরও বলছেন ধর্ম কোন যাদু নয় কোন ম্যাজিক নয়, ধর্মপথে অলৌকিক ক্ষমতার যাদু ক্ষমতা আসতে পারে, কিন্তু ধর্মের লক্ষ্য এসব নয়, ধর্ম হল ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা শুরু থেকে অদ্যাবধি চলছে প্রচার (৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের লেখালেখির পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সুনাম প্রচারের অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের ইংরেজী শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের গোচরীভূত হয়।

তখনকার দিনে কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রতাপচন্দ্র কৃষ্ণদাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিরাও শ্রীরাকৃষ্ণের সম্মোহন পারেননি এড়াতে।

৩০জুলাই ১৮৮১ খ্রীঃ কেশবচন্দ্রের "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় ঠাকুর সম্বন্ধে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকগণ বলাবলি করতে লাগলেন যে, এই মহাত্মাকে যতবার দেখছি ততবার তাঁর ভাব দেখে অবাক হচ্ছি।

এরূপ একজন সিদ্ধপুরুষ এদেশে আছে কিনাসন্দেহ, যোগবলে তাঁর মন সর্বদাই ভগবানে সংযুক্ত থাকে সাধারণ মানুষ যেমন ঘর বাড়ী ধনও মানের কথা বলেন, তিনি পরমঈশ্বর কে সেরূপ করেন।

ক্রমে ক্রমে রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, নাগ মশাই, শ্রীম গিরিশ ঘোষ প্রমুখের আগমনের প্রভাবে তার ভাব প্রচারের সগম করে তুলেছিল ও ১৮৭৯-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদরা করেন আগমন।

সতের জন ত্যাগী যথা লাটু, তারক, হরিনাথ, রাখাল, নরেন, যোগীন, বাবুরাম, বুড়োগোপাল, নিরঞ্জন শরৎ, শশী, হরিপ্রসন্ন, সারদা, গঙ্গাঘর, কালী, তুলসা, সুবোধ ঠাকুরের পতাকাতলে এসে মিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত এঁদের দলপতি, এই ত্যাগী তরুনরাই রামকৃষ্ণ আন্দোলনের বিবর্তন ও অমোঘ সত্য ও মেরুদন্ড বুড়োগোপালের সংগৃহীত দ্বাদশ গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুরের হাতে বিতরন করান।

শ্রীঠাকুরকে রোঁমা রোঁলার ‘হটকারীতা’ বলার জবাব ভদ্র ভাষায় শ্রীম (৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

এ পৃথিবীতে যাঁরা সৎ, সত্যবাদী, ঈশ্বরভক্ত এমনকি অবতার, তাঁদের সমালোচনাও কত কি হতে না পারে, জানার চেষ্টা করলে, অবশ্যই জানা যায়, নেই কোন সন্দেহ।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে কত রটনা হয়েছে না হয়েছে ভক্তবৃন্দ কমবেশী জানেন বৈকি ১০ অক্টোবর ১৯২৮ সনে রোঁলার লিখিত পত্র রামকৃষ্ণ জীবনী লেখার প্রয়াস হটকারীতা।

এ পত্রের মন্ব্যে সহজেই অনুমেয় ভদ্রবেশী জ্ঞানীরা অজ্ঞানীদের মতই কোন কোন সময় নানা মন্ব্য করে থাকেন, অবশ্য শ্রীমকে ধন্যবাদ দিতে আমার ভুল হওয়া উচিত নহে।

রোঁলার পত্রের জবাবে শ্রীম ধীর স্থিরভাবে প্রতিপ্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, যথা ঐ দেবমানব (শ্রীরামকৃষ্ণ) কিভাবে জীবন যাপন, কিভাবে রহস্যময় জীবন ও দজ্ঞেয় জীবনের সমস্যা সমাধানের জবাব দিয়েছেন।

শ্রীঠাকুরের ভারতের মানব সমাজ ও শিষ্যগনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল সবকিছু আধ্যাত্মিক জগৎ সাহিত্য জগতের উদ্ঘাটন করার মহান দায়িত্ব নেবার জন্য প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

আপনি যে পবিত্র বার্ত্তা পাঠিয়েছেন, তা আমাকে প্রিয় প্রভুর ধ্যানে তাঁর কোমলমধুর জ্যোতির্ময় মুখে উদ্ভাসিত হাসির ধ্যানে নিমগ্ন রেখেছেন।

শ্রীম একান্ ভক্ত, আবার মনীষী, তিনি জানতেন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীরা কোন তীক্ষ্ণ ও অবিশ্বাসী কৌতুহলের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনকে দেখেন বা দেখতে পারেন।

তাই প্রথমেই তিনি প্রশ্নের সামনে বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর এনে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, পার্থিক জগতের প্রতিভার বিচার চলে না, তিনি গোড়াতেই মূলোচ্ছেদ করে দিতে চাইছেন।

যেমন যীশুর ক্ষেত্রে তেমনি রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও হিষ্টারিক্যাল, ক্রিটিসিজমের প্রয়োজনের আবশ্যিকতা নেই দেব মানবই দেবমানবকে বুঝতে সমর্থ শাস্ত্র বা আযার্য্যের শিক্ষা ছাড়াই ঈশ্বরকে জেনেছেন।

শ্রীঠাকুর বেদ, পুরান, বাইবেল, কোরান সেই সঙ্গে বুদ্ধ, যীশু ও অন্যান্য দেবী ব্যাখ্যাতা তাঁর পার্থিব জীবন বৃক্ষে আগে ফল পরে ফুল সে কথা এ কথা শ্রীঠাকুরেরই কথা।

স্বামী শিবানন্দজীর জবাবে রোঁমা রোঁলা অভিভূত হয়ে অশোকানন্দজীকে জানান (৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান সন্ন্যাসীদের অন্যতম স্বামী শিবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ রোঁলার মতই প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখের পরে রোঁলা বলেন পাশ্চাত্যের কাছে রামকৃষ্ণতত্ত্ব বিবেকানন্দ নামক প্রেম ও আলোকের দিব্য উৎসবের সন্ধান দিতে চাই, তাই শিবানন্দজীর সাক্ষাতের জানান আবেদন।

সেজন্য তাঁর বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ন রোঁলা বিশেষভাবে জানতে চান মানব সাধারণের দুঃখ বেদনা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ কতখানি স্পর্শ ছিলেন?

উৎপীড়িত মানবের জন্য বিবেকানন্দের আর্তনাদ সুপরিজ্ঞাত কিন্তু রামকৃষ্ণ নিমগ্ন থাকতেন অনন্তে তিনি প্রকৃতি ও সমাজের দ্বারা নির্য্যাতিত মানুষের জন্য বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

স্বামী শিবাানন্দজী রোঁলার আকাঙ্খা পূরণ করে বিশ্বাসে দৃঢ় অনুভূতিতে স্পন্দিত ও বাল্যবধি ঈশ্বর তৃষ্ণায় থাকতেন, শ্রীঠাকুর আধ্যাত্মচরিত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর অসীম বিরাটত্বকে মুহূর্ত্ত লঘুকর হবে।

তিনি কি ভাবে নর ও নারী, পন্ডিত ও মূর্খ, পাপী ও পুন্যাত্মা সকলের প্রতি সমভাবে প্রেম বর্ষন করতেন তাদের দুঃখ উপশমের জন্য অবিরাম ঐকান্কি উৎকণ্ঠা বোধ করতেন।

এ কালের পৃথিবী তাঁর মত আর কেউকে পায়নি, যিনি মানব সমাজের জন্য নিয়োজিত ছিলেন স্বামী শিবানন্দ অনেক দৃষ্টান্ শ্রীঠাকুরের প্রেম করুনায় জানিয়ে ছিলেন।

আরও অসংখ্য বর্ণনা দিয়ে স্বামী শিবানন্দ দীর্ঘ চিঠি দিয়ে রোঁমাকে জানালে চিঠি পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি সে কথা অশোকনন্দজীকে ৪ মার্চ ১৯২৮ তারিখে পত্রে জানায়ে ছিলেন।

সিষ্টার নিবেদিতার অসাধারন ভক্তি ও শ্রদ্ধা শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের প্রতি (৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

১৮৯৮ খ্রীঃ ২৮শে জানুয়ারী থেকে ১১ মে পর্যন্ত সিষ্টার নিবেদিতার কলকাতা বাসের কিছু স্মরনীয় ঘটনা পর পর বিশ্লেষন তখনকার দিনের বিশ্লোষিত হওয়া আবশ্যক।

যে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণকেই তাঁর জাবনের ধ্রুবতারা রূপে নিঃসঙ্কোচনে ঘোষনা করেছেন ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীপূর্ণচন্দ্রের বাড়ী শ্রীঠাকুরের জন্ম উৎসবে নিবেদিতাকে স্বামিজীর আমন্ত্রন।

স্বামিজীর নির্দেশ ছাড়াই এ দিন সর্বাগ্রে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও শ্রীঠাকুরের পুত বাসগৃহ সেচ্ছা সিদ্ধান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য, স্বামিজী তখনকার হিন্দু সমাজের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কারনেই করেন নি।

মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না বটে, তবে, শ্রীঠাকুরের সেই ছোট ঘরখানি তাঁর সমস্ত শান্তি পবিত্রতা আর স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর সত্ত্বাকে অভিভূত ও পরিপ্লাবিত করল।

ভবিষ্যৎ জীবন সাধনার সূচনাতেই সেই পরমেপুরুষকে বিদেহী স্পর্শ অন্তরে অনুভব করলে নিবেদিতা কৃত কৃতার্থ, তাঁর জীবনের মহেন্দ্রক্ষণ সেদিন সেখানেই অতিবাহিত হল আনন্দচিত্তে।

১১ মার্চ ষ্টার থিয়েটারে ইংল্যান্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব বিষয়ে নিবেদিতার বক্তৃতা এটি শুধু ভারতে তাঁর প্রকাশ্য ভাষনই নয়, পরীক্ষাও বটে, কারন স্বামিজীর এটাই অভিপ্রায়।

বক্তৃতার মাধ্যমে নিবেদিতা আত্মিক যোগসূত্রে রচনা ও পাশ্চাত্যবাসী কতৃক স্বামিজী সঙ্কলিত ও প্রতিষ্ঠিত নবধর্মের বাস্তব গ্রাহ্য বিশ্লেষন প্রতিবাদন করা।

৭ মার্চ তিনি শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন পেয়ে “Day of Days” সেরা দিন ভারতীয় নারীদের পূর্ণতম বিকাশ, নিবেদিতা লিখেন, শ্রীশ্রীসারদাদেবী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নারী।

২৫ মার্চ দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবজন্ম লাভ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নৈষ্ঠিক. ব্রহ্মচর্যে ব্রতী হলেন ও নিবেদিতা রামকৃষ্ণের সঙ্গেও অন্তর্ভূক্ত হয়ে ভারতের বহু স্থানে ভ্রমন করেন।

১৩ নভেম্বর শ্রীশ্রী কালী পূজোর দিন শ্রীমা স্বয়ং ১৬ নং বোস পাড়া লেনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

(১০)

লোকভয়ে অবতারগণের আদ্যাশক্তিদের দূরে রাখা (১০)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীহরি বা নারায়নের আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী রয়েছেন বদ্রীনাথের একটু দূরে আলাদা মন্দিরে

দুজন এক সঙ্গে নেই দেখতে পাই আমরা প্রতি ঘরে ভিন্নভাবে।

শ্রীরাম চন্দ্র আদ্যাশক্তি সীতাদেবীকে অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পরে

রামচন্দ্রের অবিশ্বাস না থাকলেও প্রজাদের রটনায় সীতার গমন পাতালে।

শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণব হয়ে নবদ্বীপে আসতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন না দেওয়ার কারনে

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বাধ্য হয়ে মহাপ্রভুর যাবার পথে ধূলিতে প্রনাম।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাধারানীর সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে বহু সমালোচনা

শুনি আমরা, তা যদি সত্যই হত তবে আদ্যাশক্তি কীভাবে আসে প্রভু নিধুবনে।

নিধুবনে সন্ধ্যার পরে অদ্যাবধি কাক ও অন্য পাখী ময়ুর চলে যায় গোধূলীতে হন্য হয়ে বের হয়

আর মনুষ্যজাতিকে ঘন্টার ধ্বনি বাজায়ে বের করতে হয় পান্ডাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ একমাত্র অবতার যিনি চৌষট্টি রকম তন্ত্র সাধনা শিখেন ভৈরবী ব্রাহ্মনী হতে

সেই ভৈরবী ব্রাহ্মনী রাতের বেলা গঙ্গার অপর পারে থাকার ব্যবস্থা করে দেন শ্রীঠাকুর।

এ হল পৃথিবীর লোকভয়, বিনা দোষে করে অবতারগণকে, পাপিষ্ঠ হয় সমালোচকরা

যায় দ্রুতগতিতে কুম্ভিপাক নরক ধামে পৌঁছার প্রশস্ করে রাস্তার।

স্বামিজীর মুসলিমের হুকুতে টান দিয়ে “জাত যায়” কিনা পরীক্ষা (১১)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণের বহু অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মন শিষ্য থাকা স্বত্বেও প্রধান শিষ্যের মর্যাদা দিয়েছেন

কায়স্থ সন্তান শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্তকে, যিনি বাল্যকালেই জাত বিচার করেন।

পিতা এটর্নী জেনারেল মোসলমানদের জন্য আলাদা রাখা শুকোতে মুখ দিয়ে দেখছেন কি করে

“জাত যায়” ও পরিনত বয়সেও যাঁর ভক্ষাভক্ষের বিচার সনাতন পন্থীদের মতো ছিল না।

ইসলামীভাবে সাধনার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ এদেশের সাধারণ মুসলমানদের মতোই বেশভূষা

ধারন ও আহারাদির ব্যাপারে তাদের রীতিনীতি অনুসরন করতেন।

সমাজে মহিলাদের প্রাপ্য আসন কি, রামকৃষ্ণ তা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে ভৈরবী ব্রাহ্মনীকে

নিজের গুরুর আসনে বরন করে ও সহধর্মিনী সারদাদেবীকে জগন্মাতা বোধে পূজেঁন।

শ্রীঠাকুর নিজের সাধনার ফল সমেত জপের মালা তাঁর চরন প্রান্তে সমর্পণ করে রেখেছিলেন

আর বিবেকানন্দজী নিজেই বলেছেন, শিবজ্ঞানে জীব সেবার আদর্শ পেয়েছেন শ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে, তাই জীব সেবা করতে হবে

ঈশ্বর উপাসনার অঙ্গ হিসেবে, এরমধ্যে অনুকম্পার ভাব আনলে আত্মম্ভরিতার প্রশ্রয় হবে।

শ্রীঠাকুরের এই বানীকে স্বামিজী আমাদের দেশে সর্বপথম জন প্রিয় করে তোলেন, পরবর্তীতে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দরিদ্রনারায়ন সেবার আদর্শ ও গান্ধীজির হরিজন আন্দোলন ও ঠাকুরের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

(১২)

ভবপারে পৌঁছে ফিরে আসতে হবে কি না? (১২)

শ্রী অনিল মোহন কর

বলি মন যাবি কোথা তুই

এভব সংসার ছাড়িয়া রে।

গুরুর কৃপা না হলে পরে

কোথাও মন ঠাঁই পাবি নারে মন।

তুই শুন কান পেতে রে মন

গুরু হল ভব পারের মাঝি

নৌকা করে নিয়ে যাবে তোকে

সেই অচিন দেশের বাড়ী রে।

সে বাড়ীতে গেলে পরে সব

হিসেব নিকেশ শেষ হলে পরে,

আসবি কি থাকবি সেথায়

বলতে পারেন গুরু আর ভূস্বামী।

ফিরে আসতে হলে টিকেট খানি

নিতে হবে কিনে, এ ভবে কি দান

করছিলি রে বন্ধু মন খুলে

ভেবে দেখ ফিরে আসতে হবে কি?।

শিবের অভিসম্পাদে নারায়ন লক্ষ্মীছাড়া (১৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

আহারে ! আহারে ! আহারে !

দক্ষরাজের কন্যা ছিল এক
সতী নামে তাঁর পরিচিতি।
পিতা তাঁকে বিয়ে দিলেন
শিব শঙ্কর নামধারী এক
ত্রিকালদর্শী দেবতা
তিনি ছিলেন কৈলাস বাসী।
নেই কোন ঘরবাড়ী
থাকেন প্রকৃতির আশ্রয়ে
নেই তো চাকচক্য পোষাকের
চলেন ফিরেন সঠিক সময়ে।
নেই কোন চাহিদা সর্বদাই
মানুষের তরে ঘুরে বেড়ান।
যত্র তত্র শ্মশানের মৃতের
কানে তারক ব্রহ্ম নাম দিতে,
দক্ষরাজ করেন একবার
যজ্ঞ, নিমন্ত্রন দেন
সর্বদেবতাগণে, সম্মান দেখান
দক্ষরাজ যজ্ঞস্থলে আসলে
সকলে দাঁড়ায়ে তিনজন ব্যতীত
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব।
রইলেন বসে নিজ নিজ
আসনে, ভাবেন দক্ষরাজ
ব্রহ্মা হলেন সৃজন কর্তা,
বিষ্ণু হলেন পালনকর্ত্তা
শিব হল আমার মেয়ের জামাতা
আমি তো তার শ্বশুর হই।

উচিত তো তার সম্মান দেখানো
দাঁড়ায়ে আমাকে, আচ্ছা বেটা,
স্থির করলেন পুনঃ করলেন
দক্ষরাজ যজ্ঞের আয়োজন।
করবে না নিমন্ত্রন মোটেও জামাতাকে
যেমনি কথা তেমনি কার্য।
হল দিনক্ষন ঠিক পুনঃ
যজ্ঞের ব্যবস্থা ঠিকটাক।
হঠাৎ গিয়ে নারদ মশাই দিল
খবরটি সতীমাকে, মা গেলেন
বাপের বাড়ীতে, যজ্ঞ স্থলে দেখেন
আসন নেই শিবশঙ্করের
তৎক্ষনাৎ আত্মহুতি, যজ্ঞের
আগুনে, হাহাকার পড়ে গেল
পূর্ন সংসারে, শিব ঠাকুর যেখানে
উপস্থিত হয়ে কেঁদে কেঁদে থর্ থর্।
মৃত দেহটী কাঁধে নিয়ে শুরু
হল উদ্দন্ড নৃত্য শিব ঠাকুরের
ব্রহ্মান্ড বাঁচাতে বিষ্ণুদেব
চক্রাধার ৫১ খন্ড করেন বিভক্ত,
মত দেহাংশ পড়ে ৫১টি পীঠস্থান
হল তৈরী ভারতবর্ষে, এ কান্ড
জেনে শিব অভিসম্পাদ দেন
নারায়নকে, নারায়ন হন লক্ষ্মীছাড়া।
অদ্যাবদি প্রতিদিন হচ্ছে যজ্ঞ দক্ষরাজের
বাড়ীতে, জানতে চাইলে দেখে আসুন ঋষিকেশে।

ঈশ্বর নিজ মহামায়ায় জন্ম ও মৃত্যুকে রহিত করে প্রকৃতিতে আছেন (১৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে যে মন্ত্রটি হিন্দু উপাসনায় নারায়ন শিলার অভিষেকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে

তাহাঃ- সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং বিশ্বতো কৃতাত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলম্।

অথ্যাৎ ঃ- হাজার তাঁর মাথা, হাজার তাঁর চোখ, হাজার তাঁর পা, সমস্ জগৎকে সর্বদিক দিয়ে

পরিব্যাপ্ত করে তিনি আবার তাঁকে ছাপিয়েও রইলেন দশ আঙ্গুলে।

এভাবে প্রতীকী ভাষায় তাঁর সর্বব্যাপক্য সর্বাতিশারী রূপের পরিচয় এ মন্ত্রে দেওয়া হয়েছে

পর পর ষোল মন্ত্রে, দেখানো হয়েছে ও যা কিছু হবে সেই সবই পুরুষ।

সুতরাং এই পুরুষ পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ পুরুষ নন অপরিচ্ছন্ন অসীম সর্বব্যাপী পুরুষ

তাই একেই বলা যায় পুরান পুরুষ চিরন্ন যিনি, তিনিই সেই ঈশ্বর বা হিরন্য গর্ভরূপী পুরুষ।

একটি ক্ষুদ্র প্রস্র খন্ডে সেই সর্বব্যাপী অখন্ড চৈতন্যের ভাবনা উদ্রেকের জন্যই নারায়ন অভিষেকে এ মন্ত্রের প্রয়োগ

এ মন্ত্রটি অর্জুন পরানপুরুষ শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন কোন মানুষ বা আধ্যাত্ম্য প্রতীক নয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

যদিও অর্জুন এর আগেই তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করে বিস্মিত ও হতচকিত হয়েছিলেন, তারপরই তার মুখ নিসৃত

স্বটি বেরিয়ে এসেছিল ,তাতেই তিনি পুরান পুরুষরূপে বন্দনা করেছেন তাঁকে।

বেদের শেষভাগে সর্ব ব্যাপক এক পুরুষরূপের মহিমাজ্জল বর্ণনা শুনতে পাই বটে, কিন্তু মানুষ রূপের কেউ নেই

মানুষের রূপের মধ্যে অপার্থিব পুরুষের অভিব্যক্তির কথা রামায়ন, মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে।

সরূপতঃ তিনি দেহধারী হন না জন্মানও না, শঙ্করাচার্য বড় সুন্দর তাঁর অবতারত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন

করেছিলেন, যিনি জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, ত্রিগুনাত্মিকা নিজের মায়াকে মূল প্রকৃতিতে বশীভূত ও জন্মরহিত করে আছেন।

(১৫)

ঘাট পারের চিন্তা করা (১৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

সুজন বন্ধুরে এখনও

গুরুর কৃপা না হলে

পরে, গুরু ধর ত্বরা

করে, ও সুজন বন্ধুরে।

গুরু না ধরলে পরে, ঘাট

পার করবে কে, ভাবরে

শেষ দিনে অন্ধকার হতে

বের হতে হাত ধরবে কে?

কে বা নিয়ে যাবে তোকে

ভবনদী পার করে তীরে,

পৌঁছাবে কে? সারা জীবন

পথ চলতে যা কিছু,

করেছ, দোষ গুলো ক্ষমার

সুপারেশনামা দেবে কে ?

(১৬)

ধরতে হবে অভিজ্ঞ কান্ডারী (১৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

এলো মেলো জীবনটা

তৈরী করার অস্ত্রটা।

ধরার কায়দা ধর

বন্ধু কর, ফন্দীটা।

যেতে যেন পার

পার হতে ভব নদীটা,

জীবন-শেষে ভাই

বন্ধু, ছেলে মেয়ে,

রইবে না তোমার

সাথে, পার হতে,

শেষ দিনের রাস্টা

তাই তো সঙ্গ ধর।

তব ভবপারের মাঝি

যিনি হবেন পথের

সাথী, পথ চেনাবার

অভিজ্ঞ ভব কান্ডারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে সর্বোচ্ছ জ্ঞানের সংযোগ (১৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী বলতেন, শ্রীঠাকুরের ভাষায় খুব আর্ট ছিল, সে আর্ট আর্টিফিসিয়াল

কৃত্রিম ভাবে সাজানো নয়, এ ধরনের বাণী শিল্প কর্ষনজাত স্বাভাবিক ফলন।

এ সাজানো বাগানের শোভা নয়, যাহা অরণ্য প্রকৃতির সহজাত বৈচিত্রের আত্ম প্রকাশ

এ, ভাষা থেকে ভাষার কারিগররা কারু শিল্পের মূল প্রেরণা আহরণ করেন।

এক দিকে বেদ, উপনিষদ, পুরান, তন্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র, আর অন্য দিকে আউল-বাউল, দেহতত্ত্ব সহ জিয়া

কর্ত্তাভজা, এমনকি পথ-চলতি সাধনার ধারায় মিশে, ভাষার টানা পোড়ন তৈরী করেছেন ঠাকুর।

আগেকার দিনের গান থেকে সবযুগের বাংলা গান বিশেষত বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বাংলা গানের জগতে কখনও ধীরে ধীরে ভক্তি সঙ্গীতে বিশেষ ভূমিকার অধিকারী।

বাংলা গদ্যের নির্মাতাদের মধ্যে রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়, ভবানীচরণ, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্র নাথ

বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি বিষয় বস্তুর সমুচ্চ মহিমা ও গভীরতার বিচারে ঠাকুরের গদ্য ভূমিকার তুলনা চলে।

দুস্প্রবেশ্য জগৎ হতে সর্বজনের মুখের ভাষায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তত্ত্বকে কত সুপ্রকাশিত হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গদ্যে তার অজস্র উদাহরন, কেশব চন্দ্রের সময়ে সংগৃহীত হয়ে ঠাকুরের বানী সমাদৃত হতে থাকে।

স্বামিজী অবশ্য দেখিয়েছেন বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ অবধি ভারতের সেরা সাধকদেরই এ কাজ

সাধারণতম মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের উপলব্দির সংযোগ সাধন।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের ধারায় গুরু শিষ্যের যুগল ভূমিকায় নতন ভাবে ভেবে দেখার মতো

সকলের উপযোগী ভাষা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দিশারী।

সিষ্টার নিবেদিতার পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীমা ও শ্রীঠাকুর (১৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীশ্রীমা যিনি তাঁর মহাশক্তি সহায়ে আপন ভাগ্যকে করেছিলেন জয় আর কঠিন

সাধনায় দুর্গমের দূর্গ থেকে সাধণার ধনকে আহরণ করেছিলেন।

তাঁর মত কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন কজন নারী ? মাত্র তের বৎসর বয়সে

স্বামী সান্নিধ্যে এসে দেখলেন, তাঁর স্বামী সাধারন সংসারী নন।

সাধনসিদ্ধ এক আনন্দময় পুরুষরূপী দেব মানব শরীর ধারন দেবতুল্য মানুষ

এই দেবতুল্য মানবের সহধর্মিনী হয়ে আপন অন্তরের শক্তিতে স্বামীর ইষ্টপথের সহায়ক।

নারী নরকের দ্বার নয়, অমৃত পথের সহায়ক এই নূতন পরিচয়ে নারী জীবনের সকল অন্ধ

শৃঙ্খল বাঁধা জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, যাহা উত্তমাঙ্গ শিখরে পৌঁছে শ্রীমা তারই প্রমান।

দুর্লঙ্ঘ্য এই নারী মহিমাকে কোন দিন লঙ্ঘন করতে পারেনি কেউ, তাঁর কাছে মাথানত

করেছেন প্রত্যেকে এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ, সত্যিকার অর্থে শ্রীমা শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।

শ্রীশ্রীমা চেতনার উন্মোচনেই পৃথিবীর মহত্তমা নারী, সিষ্টার নিবেদিতার উক্তিগুলো এই ইঙ্গিত

বহন করে, একই সঙ্গে শ্রীমা আদর্শ সহধর্মিনী, আদর্শ সন্ন্যাসিনী যাঁর জ্ঞানময় জীনব ধারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা অনবদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সিষ্টার নিবেদিতা লিখছেন শ্রীমা এমনই

প্রিয় ছিলেন শ্রীঠাকুরের কাছে, অথচ মায়ের চরিত্রেও আরাধ্য স্বামী সম্পর্কে কখনও ফোটে না।

যাহা ধারনা করা যায় পানিহাটির চিঁড়ের উৎসবে ভক্তবৃন্দ সনে নৌকায় যেতে

শ্রীমা সঙ্গে যেতে অনীহা প্রকাশ করেলে, শ্রীঠাকুর বলেন, ভালই হয়েছে ওঁকে লোকে দেখলে বলবে হংস হংসী এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সংবরনের পরে বহু নাটক প্রচারিত হয়ে ভাবধারা বৃদ্ধি (১৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সংবরনের পরে গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবন চিত্রকে নানাভাবে নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর প্রথম যুগের নাটকেও ভক্তিরসের প্রাধান্য ছিল।

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্দি ও গুরুদেবের জীবনাদর্শ প্রচারের বাসনা প্রকাশিত হয় পরবর্তী সময়ে লেখা নাটক "রূপ সনাতন , পূর্ণচন্দ্র, নমীরাম" কালাপাহাড় ইত্যাদিতে।

কালাপাহাড়ে চিন্তামনি যে ভাষায় কথা বলে তা কথামৃতের, অবিকৃতরূপ, ভগবান তা হাসে না যদি হাসে-দুবার, তিনি যাকে মারবে মনে করছেন, আর যদি কেউ বলে,

তারে রক্ষা করবে কে? তখন একবার হাসেন আবার যখন দুজন দঁড়ি ফেলে বলে এ দিকটে তোর ওই দিকটে আমার, তখন একবার হাসেন, কালাপাহাড়ের রচনা কাল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক নাটক ও সঙ্গীত যেমন প্রোউৎসাহিত করেছিল, অপরদিকে তেমনি উদ্বেলিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের হৃদয়, রামচন্দ্র দত্ত একদা নিরীশ্বরবাদী ও ভক্ত হয়ে লীলামৃত নাটক রচনা করেন।

লীলামৃত নাটকে নব অবতারের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়েছে নারায়নের সংলাপে জ্ঞানভক্তির মুর্ত্তি ধারন করব ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তাদের মুখে তত্ত্ব-কথা প্রকাশিত করবো।

নাটক শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তির সামনে কীর্ত্তন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ লীলার মূল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, আরও অনেক অনেক নাটক রচিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রসারিত হয়।

মহাপ্রভু শ্রীনিমাইর গয়াধামের শ্রীবিষ্ণপাদপদ্ম দর্শন (২০)

শ্রী অনিল মোহন কর

পিতৃঋণ শোধ করতে নিমাই গয়াক্ষেত্রে যাত্রা করলে সঙ্গে চলেছেন বহু শিষ্য যেমন চন্দ্রশেখর গং

গঙ্গা ধারে ধারে চলে মন্দারে পৌঁছে নিমাই এর কঠিন জ্বর দিল দেখা।

ইহাতে সঙ্গীরা ভীষন চিন্তিত হলে বৈদ্য কবিরাজ আনার ভাবনা করলে নিমাই সেখানকার

ব্রাহ্মনের পাদোদক আনার ব্যবস্থা হউক, জানালে সঙ্গীরা তাই ব্যবস্থা করল।

ব্রাহ্মনের পাদোদক পান করা মাত্র তাঁর জ্বর ছেড়ে নিমাই সুস্থ্য হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু সবাই

নানা মন্তব্য প্রকাশে নানান কথা দানা বাঁধল, কেউ বলেন ব্রাহ্মনের মাহাত্ম দেখাতে এমন,

নানা জনে নানা কথা বলেন, আসলে সঙ্গীদের একজন সেকানকার ব্রাহ্মনের আচারে ঘৃনা হলে

নিমাই ব্রাহ্মনের মাহাত্ম্য দেখাতে এমনতর করার কারন ইত্যাদি মন্তব্য হল প্রকাশ।

নিমাই পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে পৌঁছলেন গয়া ধামে, সেথায় পৌঁছার পর দেখা গেল, নিমাইর

চাঞ্চল্য নেই, দ্রুত গমন নেই, হাস্য কৌতুক নেই, ধীর গমন, গম্ভীরভাবে সম্পূর্ণ কায্য চলছে।

ভক্তি উদ্দীপক যাহা দেখেন তাহাই প্রনাম, ক্রমে শেষ হল সর্বকায্য, প্রনাম করতে গেলেন

গয়াসুরের মস্কে শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন যাহা সহস্র সহস্র বৎসরে তাঁর হয় না কৃপা দর্শন।

যাহা শ্রীভগবানের পদ-নখ জ্যোতিঃ ঐ পদ হতে গঙ্গা উৎপত্তি ও ঐপদের নিমিত্ত মহাদেব উন্মত্ত

অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের স্বামীর ঐ পদচিহ্ন দেখিয়াই নিমাই স্তম্ভিত ও এক সৃষ্টিতে দেখেছেন,

নিমাইর ঠোঁট কাঁপছে, নয়নে জল নিবারন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে নয়ন-তারা জলে ডুবে গেল

ঐ জল ত্রিধারা হয়ে নয়ন হতে বুকে, বুক হতে মাটিতে পড়ে ঐ স্থান হল জলমগ্ন।

নিমাই বাক্যহীন, কণ্ঠে শব্দ নেই, মৃদু মৃদ কাঁপছে বদন চন্দ্রমা এত প্রফুল্ল হয়েছে যে দর্শকগণ

নিমিষহারা হয়ে কেবল সুধা পান করছেন এমনি সময়ে ঈশ্বরপুরীও দেখছেন সব।

এতক্ষন ঈশ্বরপুরী সমস্ত দৃশ্য দর্শন করে, উহার মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য নিমাইকে বুকে নিয়ে

জড়ায়ে ধরলেন, যিনি মাধবেন্দ্র পূরীর শিষ্য, নিমাই বল্লেন গোসাই আমায় করুন উদ্ধার।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী বেশ ধরার স্মরণে আমার প্রনাম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীগণকে (২১)

শ্রী অনিল মোহন কর

মহাপ্রভু নিমাইর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখেছিলেন নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছেন

আর অনন্কোটি লোক তাঁর পশ্চাৎ তাঁকে নতি করতে করতে চলছেন।

আবার শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া বাসরঘরে যেতে পায়ে হোছট লেগেছিল তাহা নিমাই পন্ডিতের ব্রাহ্মন প্রদত্ত

অভিশাপের ফল যাহা "তোমার সংসার সুখ নাশ হউক" এতদিন পরে সকল হতে চলছে।

যুবতী স্ত্রীকে ঘরে রেখে বৃদ্ধা জননী সহ সকলকে ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যাহা কপালের লিখন

বলেই এসব অঘটন ঘটন হয়ে থাকে, ইহাই প্রথিবীতে শাস্ত্রে তাৎপর্য।

নিমাই পন্ডিত যখন ঘর ছেড়ে রাতে সন্ন্যাস গ্রহন করতে ভারতী গোসাইর নিকট পৌঁছেন তখন

ভারতী গোসাইজীর কি সাংঘাতিক অবস্থা ভাবলে ভারতী গোসাইর কেন থাকবে না কেহই স্থির।

কারন কম বয়স ঘরে নববিবাহিতা স্ত্রী ও বিধবা মাতাকে রেখে কে এই সন্ন্যাস দেবেন নিমাইকে

তাই ভারতী গোঁসাইকে নানাহ মন্ব্য করে , কেউ যষ্টি হস্তে, কেউ তর্জ্জন করে মারতে উদ্যত।

কেউ বলে ভারতী গোঁসাইকে, তিনি একটি বড় স্বীকার পেয়েছেন, তাকে মারলে কোন পাপ নেই

কেউ বা তুই সন্ন্যাসী নয়, তুই হিংস্র পশু, কেউ বা বলে ইহা তর্জ্জন গর্জ্জনের কাজ নহে।

দেখনা সন্ন্যাসী বেঠা বসে আছে, তাকে ধর সকলে কাঁধে করে উঠিয়ে গঙ্গার ওপারে লয়ে যাই

তখন ভারতী গোঁসাই দাঁড়ায়ে বলেন, যদি তোমরা আমাকে বধকর তবে বন্ধুর কায্য হবে।

তোমরা যে বস্তুটি দেখছ, ইনি স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, আমি রোধ করতে পারলাম না, ত্রিজগতে

কেউ রোধ করতে পারবে না, দেখনা, তাঁর মেসো আচার্য্য রত্ন বসে আছেন, উনিও অপারগ।

আমি বাধ্য হয়ে গোলকের অধিকারীকে কপীন পরাব, কাঙ্গালের বেশ ধরার এ দুঃখ চিরদিন আমার

থাকবে, এ কলঙ্ক জীবনভর থাকবে, দয়া করে তোমরা আমায় বধ করে যন্ত্রনা দূর আমার।

এ সংসারে সন্ন্যাস নেওয়া যে কত বেদনাদায়ক তাঁদের পিতা, মাতা, ভাই, বোনদের যে কত কষ্ট

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বস্তরের সন্ন্যাসীদের জানাই আমার সাষ্টাঙ্গ প্রনতী।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগলিত ভাব শ্রীজগন্নাথ ধামে (২২)

শ্রী অনিল মোহন কর

সকলেই জানেন শ্রীমতী শচীর উদরে নবদ্বীপে শ্রীনদের নন্দন জন্মে সন্ন্যাসীরূপে নীলাচলে বাস করছেন, অদ্য রথযাত্রার দিন তিনি নয়ন গোচর হয়েছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম তরঙ্গের, নৃত্য যিনি দর্শন করেছেন, তিনিই অভিনব করেন তাঁর নৃত্য কেন মোহিত করত নবীন গৌরতনু সর্ব সম্মুখে শ্রীজগন্নাথ সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভক্ত।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ প্রভুর উদ্দন্ড নৃত্যে বিকার অষ্ঠসাত্ব ভাবের উদয় করলে অদ্ভূত দর্শনে দ্রবীভূত হয়ে অলৌকিকভাবে মুগ্ধ হয়ে মাঝে মধ্যে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত অবস্থা।

এ নৃতের মাঝে মধ্যে যুগ্ম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি বারম্বার কপালে শ্রীজগন্নাথকে প্রনাম করতে করতে নৃত্য চলছে তিনি শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া যেন বলছেন, আমার আর ভয় কি, তোমার বলে বলীয়ান আমি।

সেই ভাবে ভাবিয়া তাল ঠুকিয়ে মুখে জয় জগন্নাথ আর দেহের কম্পনে দন্তে দন্তে আঘাত লাগছে কাজেই নৃত্যের তালে ও ভাবোল্লাসে জয় বললে জজ জগন্নাথ বলতে জগ জগ করছেন।

যখন মাটিতে আছড়ে পড়ছেন লক্ষ লক্ষ প্রেম তরঙ্গে পড়ে যেন কিছু একটা হয়ে যাচ্ছেন, তখন কি রাজা, কি প্রজা, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলেই আত্মহারা হয়ে বিভাসিত হচ্ছেন।

মহাপ্রভু মুর্হুমুহুঃ পড়ছেন আর নিতাই, শ্রীঅদ্বৈত ও স্বরূপ তাঁদের মধ্যে যে কাছে তিনিই তাঁকে ধরছেন এ ভাবে নৃত্য করতে করতে রাজার নিকট এসে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তখন রাজা প্রভুকে উঠাতে গেলেন আর লক্ষ লক্ষ লোক স্তম্ভিত হয়ে প্রভুর কান্ড দর্শন করলেন ঈশ্বরের প্রেমে প্রকৃত রসিক ব্যতীত এ বিগলিত ভাব সকলে হয়ত করা নহে সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শ্রীমহাপ্রভুর ন্যায় নৃত্যের তালে গান করতেন, তবে শ্রীঠাকুর মাতৃভাবে বেশী ভাবিত বলে এতটা বাহিরে বিগলিত ভাব প্রদর্শন করেন নাই।

(২৩)

নীলাচলের পথে রজককে মহাপ্রভুর উদ্ধার (২৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসী হয়ে গৌরদেশ ত্যাগ করে নীলাচলে যেতে অসীম শক্তির সহায়তা লইতে বাধ্য হন

পথিমধ্যে একজনকে উদ্ধার করতে হবে যেন দৃষ্টিমাত্র কায্য সমাধা চাই।

শ্রীপ্রভু বিভোর হয়ে পথ চলছেন সঙ্গে ভক্তগণ সেই পথে একজন রজক কাপড় কাচছে

সেখানে এসেই প্রভু যেন চৈতন্য পেয়ে-রজকের দিকে যেতে লাগলেন, সঙ্গে ভক্তগণ।

তাঁহাদের আগমণ রজক আড়চোখে আপন মনে কাপড় কেচে চলছে শ্রীগৌরাঙ্গ রজকের নিকট

পৌঁছে বলেন, "ওহে রজক একবার হরি বল" সাধুগণ ভিক্ষা করতে আসছে মনে করে রজক।

রজক বলল, আমি অতি গরীব, ভিক্ষা দিতে পারব না, প্রভু বলেন, তোমায় ভিক্ষা দিতে হবে না

তুমি কেবল হরি বল একবার, রজক ভাবল ঠাকুরের মনে কোন অভিসন্ধি আছে।

নচেৎ হরি বলতে বলল কেন? তাই হরি না বলাই ভাল, এই ভেবে কাপড় কেচে কেচে রজক বলল

ঠাকুর আমার বাচ্চা কাচ্চা আছে, আমি পরিশ্রম করে তাদের অন্ন সংস্থান করি।

আমার এখন হরি বোলা হলে, তারা উপোস করে মরবে, প্রভু বলেন তোমার কিছু দিতে হবে না

শুধু একবার হরি বল, রজক ভাবছে এ দায়তো মন্দ নয়, কি জানি কি হবে, তবে না বলাই ভাল।

রজক ইহাই সাব্যস্ করে, রজক বল্ল ঠাকুর তোমাদের কাজকর্ম নেই, আমরা পরিশ্রম করে তাদের অন্ন সংস্থান

করি, এখন আমার হরি বোলা হলে তারা উপোস করে মরবে, আমি কাপড় কাচছি।

প্রভু বল্লে তুমি দুকাজ এক সঙ্গে করতে না পারলে তুমি হরি বল আমি কাপড় কাচছি

রজক তখন ভাবল, গোঁসাইয়ের হাত ছাড়ান মহাদায় হয়ে পড়ল, এখন কি করি।

রজক এতক্ষন মুখ উঠায়নি, এখন প্রভুর মুখপানে চেয়ে মুখে হরি বোল, হরি বোল বলতে শুরু

ক্রমে বসা থেকে উঠে নাচতে নাচতে হাত উঠায়ে মুখে হরিবোল হরিবোল বলতে লাগল।

মহাপ্রভুও হরিবল হরিবল বলতে বলতে কেঁদে কেঁদে গৌর দেশ ছেড়ে নীলাচলে পৌঁছেন

এহল নামের মহিমা, যে নামে গুরু দীক্ষা দেননা কেন, নামেই মুক্তি লাভ।

পতনন্মোখ সনাতন ধর্মকে রক্ষাকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব (২৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই মা বলে ডাকা 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কি না

এই মা-ই বিশ্ব সংসার পরিচালনা করছেন, আবার নির্গুনা হয়েও সগুনা হন।

তবে ভক্তের অভিলাষ অনুসারে উপাসকদের চাহিদা ও বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধা অনুযায়ী

যে ভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক না কেন ভক্তের অভিষ্ট ফল পেয়ে থাকেন।

মা জগজ্জননী নির্গুনা হয়েও কখন পুরুষরূপ কখন বা স্ত্রীরূপ ধারণ করে থাকেন

মা যেন একজন অভিজ্ঞ অভিনেত্রী লোক রঞ্জনের জন্য যেন যে কোন রূপই ধরা সম্ভব।

অভিনয়কালে মাকে চেনা বড় শক্ত কাজ তিনি যেন যে একজন নিপুনা অভিনেত্রী

নির্গুনা দেবী-নিরাকারা হয়েও স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদি ও গুন সমন্বিত রূপ ধারন করেন।

তিনি কখন কালী, কখন কৃষ্ণ, কখন বিষ্ণু কখন শিব, কখন যীশু, কখন বা আল্লাহ্ প্রভৃতি

রূপ ধারন করেন, সাধারণ মানুষ তাঁকে বুঝতে পারে, না পেরে ভেদদর্শন করে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন - যতলোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, হিন্দু, মুসলমান,

ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব সব একে অন্যের সহিত নানারূপ ঝগড়া।

এ বুদ্ধি প্রয়োগ করছে না যে, যাকে কৃষ্ণ বলছে, তাঁকেই শিব, তাঁকে আদ্যাশক্তি আবার তাঁকেই

যীশু, তাঁকেই আল্লাহ বলা হয়, এক রাম তাঁর হাজার হাজার নাম।

যিনি যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ ধারন করে জগতে অবতীর্ণা হয়ে স্বয়ং জগজ্জননী মানব শরীর

ধারন করে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ন ও জগৎ কল্যানের সাধনে অবতীর্ণ হন।

তাইতো দেখি আমরা পতনোম্মুখ সনাতন ধর্মকে রক্ষার্থে ও নববলে বলীয়ান হয়ে এ ধরায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শ্রীমাসারদাদেবী রূপে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভর ঘর ছাড়ার দিন বিষ্ণুপ্রিয়ার আর্তনাদ (২৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীমন্ মহাপ্রভূ যবে রাতে চলে গেলেন ঘর হতে, সন্ন্যাস গ্রহনের তরে, সে রাতে

বিষ্ণুপ্রিয়া, না পেয়ে স্বামী খুঁজে বিছানাতে কাঁদছে দুখে দুখে।

তাই শ্রী অমিয় নিমাই চরিত গন্থে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ কর্তৃক

প্রদত্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার আক্ষেপ পূর্ন মন্ব্য হুবহু উদ্ধৃত ঃ-

আমার বয়সী যে তোমা দেখিল কত না নিন্দিবে মোরে।

সে তো অভাগিনী হেন গুনমনি কেন রবে তাঁর ঘরে?

যদি রূপ গুন থাকিত তাহার পতি কি যৌবন কালে,

কপান পরিয়া কাঙ্গাল হইয়া গৃহ ছাড়ি বনে চলে?

নিঠর রমনা পাপিনী তাপিনী পতি দেশান্র করে,

নির্দয়া হইয়া চলিছ ফেলিয়া লোকে গালি পারে মোরে ।।

আমি কি তোমায় দিয়াছি বিদায় সত্য করে বল নাথ।

তোমার লাগিয়া মরিছি পুরিয়া তাহে লোক পরিবাদ

তুমি মোর পতি হইয়াছ যতি একা মোর সর্বনাশ

প্রিয়ার রোদন তারিবে ভূবন আর, বলরাম দাশ।

এভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ছেড়ে নিঃশ্বাস রইলে ঘরে, সহিয়ে বেদনা বুকে ধরে

ভেবে দেখুন পাঠকগণ, এহল প্রকৃত রহস্য অবতারগণের, সকলের শিক্ষার তরে।

বাদশাহ আকবর সনাতনকে সাহায্য দিতে চাইলে সনাতনের চতুর্দিকে মনিমুক্তা দর্শন (২৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

বন্দাবন তখনকার দিনে জঙ্গলময়, নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কি সে নগর গেছে ছাড়ে খাড়ে

মুর্হুমুহুঃ মুসলমান গন নগর আক্রমন ও লুন্ঠন করছে বারে বার।

কাজেই ভদ্র লোকের প্রায় ধনোপার্জন একেবারে ছেড়ে গিয়ে কেবল কুস্া করে গুন্ডা হচ্ছেন

নইলে জাতিও মান থাকে না, নিকটেই আগ্রা যেথায় মুসলমান রাজত্ব।

মূলতঃ সেদিক হতেও কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নেই, তাই গোস্বামীগণ বিনয়ের খনি হয়ে

যদি কেউ তাঁদের প্রনাম করেন, অমনি তাঁহাকে প্রতি প্রনাম জানান।

কাহাকেও তাঁরা নিরাশ, অভক্তি, অপদস্থ কি অনাদর করতে জানেন না গোস্বামীগণ

গ্রন্থাদি লিখছেন, এ সময় পন্ডিত এসে অসার শাস্ত্রের বিচার করে সময় করেন নষ্ট।

নানাহ কারনে গ্রন্থলেখা বন্ধ হবার কথা তবুও গোস্বামীগণ সহস্র গ্রন্থ লিখেন

ইহাদের একেকখানি গন্থ বহু মূল্য রত্ন, ইহা কি ভগবানের কৃপা ছাড়া ভিন্ন নহে।

জঙ্গলময় বৃন্দাবনে ক্রমে ক্রমে তাঁদের সুযশ ভারতের সর্বত্রই ব্যপ্ত হতে লাগল, কাঙ্গাল ভক্তগণ

বৃন্দাবন আগমন করে সন্ন্যাসী গোস্বামীদিগের আশ্রমে রয়ে গেলেন।

আস্তে আস্তে ভক্তগণ বৃন্দাবনে ধনীলোক মহাজন ও রাজাগণ গোস্বামীদের নিকট এসে নিজেদের

দেহ স্বজন-সম্পদের সহিত অর্পন করছেন, এমনকি দিল্লীর বাদশাহ্রও আগমন ঘটে।

দিল্লীর বাদশাহ আকবর কৌতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত রূপসনাতনকে দর্শন করতে বৃন্দাবনে আসেন

যখন সনাতনের সম্মুখে আকবর জোড়করে দন্ডায়মান হলেন, তখন সনাতনের বিপদ

কারন সন্ন্যাসী উদাসীনের রাজ দর্শন নিষেধ তাই বাদশাহ আসলে গাছতলায় মস্ক নত

করে বিনয়ে “আকবর মহাশয় লোক” সম্বন্ধে রাজদর্শন নিষেধ বলে জ্ঞাত করেন।

ফেরৎকালীন আকবর বলেন গোঁসাই আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে চাই, উত্তরে সনাতন জানান

তিনি উদাসীন তাঁর পাইবার কিছু নেই, বাদশাহ্ তখন বাহ্য দৃষ্টিতে যমুনাকুল সর্বত্র মনিমুক্তাতে পরিপূর্ন।

শ্রীমহাপ্রভুর নবম দশার পর দশম দশা (মরন দশা) বর্ণনা (২৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

একদা আমেরিকা দেশের একটি ঘটনা হলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিপুল প্রচার হয় যে, একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতীর মৃত্যু হয়েছে, প্রথমত তার আত্মীয় স্বজন উপস্থিত। ক্রমে রাত্রি আগত কয়েকজনস্ত্রী-পুরুষ মৃতের কাছেই রয়েছে দুএক জন করে সজাগ থেকে অন্যেরা সবাই নিদ্রিত, গভীর রাত্রিতে সজাগ ব্যক্তিরা মৃতের দেহটী দেখলেন। তাদের চিৎকারে ঘুমন্ত অন্যেরা সজাগ হয়ে সকলেই মৃত যুবতীটি দাড়াঁয়ে ইতস্ত বিচরণ করছে, সকলেই বালিকার পরকালের জন্ম দেখলেন, মৃতের জননী শোকে পাগল। তিনি অন্যস্থানে ছিলেন বলে তাঁর কন্যার এহেন অবস্থা দেখেন নাই, তবে এ তথ্যটি শুনে শোক ভুলে নৃত্য করতে লাগলেন, তাঁর কন্যার মৃত্যু হয়নি, জীবিত হল বলে শোক গেল।

বিরহ বেদনা পর্ন ভাবে উদয় হলে দশদশা “উপস্থিত হয়, শ্রীরূপ গোস্বামী রস শাস্ত্রে “দশদশা” যথা- চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশাঙ্গতা, অঙ্গের মালিন্য, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মুচ্ছা ও প্রায়মৃত্য বা মৃত্যু। শ্রীরূপ উল্লেখিত লক্ষন নির্ধারিত করছেন মহাপ্রভুর ভাব দেখে জানলেন যে, প্রভুর নয়টি দশা কৃষ্ণ বিরহে প্রত্যহই হত, তবে মাঝে মাঝে দশমদশা হত কিন্তু, মৃত্যুদশাটি কেবল বাকি আছে।

প্রভুর এ অবস্থা দেখে কৃষ্ণ যাত্রার সৃষ্টি ও পরিবন্ধন হল বদন অধিকারী যেন রাধাকে লয়ে কৃষ্ণযাত্রা করছেন প্রভু ঘন ঘন মুর্ছা যাচ্ছেন প্রলাপ বকছেন কখনও নিজেই বাহ্যজ্ঞান লাভ করছেন।

রজনী হচ্ছে দেখে স্বরূপ ও রামরায় অনেক যত্ন করে কতক বা বল দ্বারা প্রভুকে শয়ন করায়ে প্রদীপ নির্বান করে বাহির হতে শিকল দিয়ে দ্বারে গোবিন্দ ও স্বরূপ শয়ন করলেন।

প্রভু যদিও শয়নে তবুও উচ্চস্বরে নাম কীর্ত্তন করছেন হঠাৎ প্রভু নীরব, তারা ভাবলেন প্রভু নিদ্রাবিভূত ইহা ভেবে শিকল খুলে ঘরে প্রবেশ করে দেখেন গৃহ শূন্য, প্রভু নেই।

এখন সকলের নিকট সংবাদ পৌঁছার পর খোঁজা খুঁজি করতে দীপ জ্বেলে দেখেন শ্রী মন্দিরের সিংহ দ্বারে উচ্চস্বরে কৃষ্ণ নাম করতে করতে জোর স্বরে কৃষ্ণনাম করে উঠে বসলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ জীবনে তার স্পর্শে বহুজন দীক্ষা লাভে ধন্য (২৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রাস্ত্র অনযায়া দীক্ষা তিন রকমে দেওয়া যেতে পারে মন্ত্রের মাধ্যমে, স্পর্শের মধ্য দিয়ে ও কেবল ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে

অধিকাংশ গুরুদেবই প্রথমোক্ত উপায়েই দীক্ষা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু কোন কোন আচার্যের মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা থাকে, যার জন্য তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে দীক্ষা

দিতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে আমরা সেটাই দেখতে পাই।

এটা আমরা সকলেই জ্ঞাত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই নানা ধরনের আধ্যাত্মিক ভাবে আবিষ্ট হতেন

কি দৈনন্দিন স্বাভাবিক অবস্থাতেও তিনি সদা ভাব মুখে থাকতেন।

এটি চেতনার একটি স্র যখন সর্ববস্তু সর্ব প্রানীকে একবলে মনে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে

বিশ্বজুড়ে এক আমিই বিরাজ করছি, এ ধরনের একটি অনুভূতি ও থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমস্ শিক্ষা এই ভাব মুখে অবস্থান করেই দিয়েছেন, তাঁর কয়েক জন

ভক্তকে তিনি যে স্পর্শের মাধ্যমে দীক্ষা দিয়েছেন তা এ ভাবমুখ স্র থেকেই।

এই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে অনিবায্য ভাবেই সেই ভক্তের বহু বিচিত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে তা জ্যোতি

দর্শনই হোক, কিংবা নির্বিকল্প সমাধির মত চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি হউক।

শ্রীঠাকুর সর্বদাই ভাবমুখে অবস্থান করতেন এটি মনে রাখলে আমরা স্পষ্টতর ভাবে

বুঝতে পারি, কেন তিনি চিরকাল গুরু হতে অস্বীকার করতেন।

সে কারনটি হল, তিনি প্রত্যক্ষ করতেন যে, গুরুরূপ যাঁকে সম্বোধন করা হয় সে মানুষ

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করছেন না, তাঁর পেছনে রয়েছে ইে পরম সত্য।

এ উপলব্ধি কথা তিনি এ ভাবে প্রকাশ করেছেন ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র

শ্রীঠাকুরের জীবনের শেষ পয্যায়ে বহুলোক তাঁর স্পর্শে দীক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর প্রথম মিশন ও কথন (২৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিকট এসে তাঁর ভাব দেশে ও শ্লোক শুনে স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষন শ্রীচরণ দর্শন করতে লাগলেন, পরে ভাবছেন প্রভুর শ্রীপাদ স্পর্শ করে অকৃপার ভাজন হবেন।

আবার রাজা ভাবছেন প্রভু যদি পানে মারেন তবে তাঁর শ্রীচরণ ধরেই মরব, রাজার মনে ভয় পৌঁছে প্রভু ভাবেন যে, তিনি রাজা বলে প্রভুর বিনা অনুমতিতে শ্রীচরন স্পর্শ করবেন কেন?

রাজা আবার পুনঃ ভাবেন যে, যদি অপরাধ হয়, শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে কোন বিপন নেই এ ভেবে সঙ্কল্প করে পদতলে বসে হস্দ্বারা শ্রীচরন সেবা করতে লাগেন।

রামানন্দ রায় রাজাকে শিখায়ে দিলেন প্রভুর পদ সেবা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা শুনাইতে, রাজা কোথা পাঠ করবেন, কিরূপে পাঠ করবেন, রামরায়ের কাছে জেনে নেন।

রাজা পদসেবা করতে করতে ধীরে গোপী গীতার প্রথম শ্লোক পাঠ করলেন, যথা

গোপীগণ বল্লেন হে দায়িতা! তবজন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজ মন্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হয়েছে।

অপর, তুমি এখানে জন্মেছ বলে কমলাও এ ব্রজমন্ডলকে অলঙ্কৃত করে এ স্থানে নিত্য বিরাজমানা, হে প্রিয়, কারনেই ব্রজ আমোদান্বিত সকল ব্যক্তি।

এ স্থানের সকল গোপী তোমার অন্বেষন করে কাতর হচ্ছে, কৃপা কর তাদের দর্শন দাও

প্রভুর মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত হত, কারন তাঁর হৃদয় কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল।

এ শ্লোক শুনা মাত্র প্রভুর প্রফুল্ল বদন আরও প্রফুল্লিত হল, ইহা দেখে রাজা পরম আশান্বিত হয়ে ঐরূপ পদসেবা করতে করতে আরেকটি শ্লোক পাঠ কলেন।

যাহা- হে সম্ভোগ পতে ! অভীষ্ট পদ! আমার তোমার বিনা মূল্যের দাসী তুমি শরৎকালে সজাত অথচ বিকচিত কমলগর্ভের শোভাহারী নেত্রদ্বারা আমাদিগকে বধ করছ।

ইহা কি অস্ত্র দ্বারা বধ নয় কি ! ইহা অবশ্যই বধ, তাই তোমার দৃষ্টি দ্বারা অপহৃত মোদের প্রান প্রত্যর্পন নিমিত্ত দর্শন দাও, প্রভুর আনন্দ তরঙ্গ আরও বেড়ে উঠল।

তখন যদিও প্রভুর নয়ন মিলালেন না কিন্তু মুখে নিতান্তে হর্ষ প্রকাশ করে বললেন বল, বল, তারপর গোপীগণ কি বল্লেন বল, প্রভু এই প্রথম রাজার সহিত কথা বললেন।

স্বীয় মনকে রাখতে হবে নিজ গোলাম করে (৩০)

শ্রী অনিল মোহন কর

শাস্ত্রে বহুভাবে বহু রকমে আমরা করতে পারি, ভজন যার যার ইষ্টদেবকে

তবে সখ্য প্রেম, কান্তাপ্রেম এ ভাবে ভজন মানুষের উত্তম পথ নহে।

উত্তম পথ হতে পারে দাস্য ভাবে ভজন করা হতে পারে, কান্তভবে ভজন

বা সাখ্য ভাবে ভজন করতে মন বলতে পারে, তবে ওঠা উচিত নহে।

মনুষ্যের মন কখন কি কহে, না জানে ভবে, মনুষ্যজাতি কভুও

তাই স্মরনে রেখে সদা, মন কখন কি কহে না কহে।

মনের কথা-ই আমরা মানবজাতি চলি ফিরি, দেখি, করি সবই

এ ভবে, তাই তো মনবেটা কখন কি কহে, ঠিক নেই তার।

তাইতো মনকে যত শাসন করি না কেন, মন তো উতালা তালে চলে

তাই সাধু সজ্জন ঠিক রইতে পারে না, মনের জ্বালায় বটে।

মন চায়, যাহা তাহা, যখন তখন তাই তো মানুষ হবে তার গোলাম

মনকে বল না ভাই, কর তুমি মন, গুরু ভজন যখন তখন।

শুনবেনা ও পারবে না করতে বা শুনতে তব নির্দ্দেশনামা সকল, নানা

অজুহাতে করবে না তো ভজন, আমার আপনার আদেশ মত।

তাই সময় থাকতে হাতে, করতে হবে শাসন মনকে শক্ত হাতে, কম

বয়সে, হবে না ভাই কেউ, তব মনের গোলাম, হবে মন তব গোলাম।

রাজা প্রতাপ রুদ্রের শ্লোক পাঠ শুনে রাজাকে মহাপ্রভু ধরে উভয়ে অচেতন হলেন (৩১)

শ্রী অনিল মোহন কর

রাজা প্রতাপরুদ্রের সর্বপ্রথম নয়ন মিলন ও তারপর গোপীগণ কি বললেন প্রভুর প্রশ্নের জবাবে

রাজার আনন্দে কণ্ঠ রোধ হয়ে যাচ্ছে, অনেক কষ্টে রাজা শ্লোক পড়লেন।

যথা- হে দেব, আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ন কর, হে বিরিঞ্চি বংশ শ্রেষ্ঠ

তোমার চরন কমল পাপীদিগের অভয় দান করে, আমরা সংসার ভয়ে ভীত।

যাহা বর প্রদ, অনুগ্রহ করে তাহা আমাদের মস্কে নিহিত কর, প্রভু এই শ্লোক শুনেই আনন্দে

জড়বৎ হলেন, ও পুলকাবৃত্ত শ্রীঅঙ্গে মুর্হুমুহুঃ, আরও পলকের সৃষ্টি হতে লাগল।

প্রভু বহু কষ্টে ভাঙ্গাস্বরে বলেন তারপর, তারপর, রাজা বল্লেন সখে! তুমি ব্রজগণের আর্তিহরী

হে বীর! তব মন্দহাস্য নিজ জনের গর্বহারী আমরা কিঙ্করী দয়া করে আশ্রয় দাও আমাদের।

হে সখে! আমরা অবলা, প্রথমে আমাদেরকে বদন কমল দর্শন দাও, মহাপ্রভুর মনে হচ্ছে

যে, তিনি শ্লোক পাঠ করছেন, তাঁকে উঠে গিয়ে আলিঙ্গন করেন।

কিন্তু উঠতে পারছেন না, যেন শ্রীঅঙ্গ এলাইয়ে পড়ছে, রাজা প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না করে

আরও পাঠ করেন, হে পদ্মলোচন! তব মধুর বানী সুন্দর বদাবলী সমলঙ্কৃতা ।

এই বানীর দ্বারা আমাদের মোহ জন্মেছে হে বীর! আমরা তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধহয়ে

মারা পরি, তাই অধরামৃত প্রদান করে আমাদিগকে জীবিত করুন।

পভু পুনঃ উঠতে গেলেন কিন্তু উঠতে পারলেন না রাজা বুঝলেন প্রভু শুনার জন্য কান পেতেছেন

<u>অমনি রাজা পাঠ করলেন</u> ঃ -

“তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্

শ্রবনং মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃহন্তি যে ভুবিদা জনাঃ”।

এ শ্লোক প্রভু শুনে হুঙ্কার করে উঠে রাজাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে কিছুক্ষন উভয়ে অচেতন হয়ে রইলেন।

বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব পরিচিতি করান স্বামিজী মহারাজ (৩২)

শ্রী অনিল মোহন কর

এ বিশ্বে তথা ভারতে এমন এক ব্রাহ্মন সন্তান জন্মেছেন , তিনি এ জগতে জন্ম নিয়ে

বিশেষতঃ সনাতন ধর্মে কেন সব ধর্মে সাধন ভজন করে পেয়েছেন বৃহৎ কিছু।

যা আমরা দেখিনি বই পুস্তকে বা শুনিনি কানে, যিনি করেছেন প্রমান সকল ধর্মেই

নানাবিধ নামে রয়েছেন তিনি একই বস্তু, যাঁর অস্তিত্বের খোঁজ করেন সকলেই।

ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন সাদাসিদে, নেই কোন অভিমান, ভীষন কৃচ্ছতা সাধনের মধ্য দিয়ে

চরিত্র বিকশিত হয়েছে, কিন্তু দেহের কৃশতার মধ্যে ও মুখের ছাপ শিশু সুলভ কোমলতা।

সাধু বা সন্ন্যাসী বাহ্যিক রূপ বা আচরন থাকা সত্ত্বেও গায়ে নেই কোন গৌরিক বস্ত্র

মানুষটি অসাধারণ ও সম্পূর্ণ উদাসীন শুধুমাত্র এ মর্য্যাদা করতেন।

তাঁকে কেউ আচায্য বা গুরু বললে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ মর্য্যাদা করতেন

অস্বীকার, কেউ তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলে করতেন অসন্তোষ প্রকাশ।

লোকে তাঁকে দর্শণ ও প্রশংসা করুক তাঁর একান্ত অপছন্দ ও মনোভাব আচরনে ব্যক্ত করেন

বিষাসক্ত ও ইন্দ্রিয় পরায়ন ব্যক্তিদের সঙ্গ তিনি সাবধানে করেন পরিহার।

বাহ্যতর তাঁর অসাধারনত্ব নেই কিছু উপদেশ হিসেবে তিনি নিজ ধর্মের কথাই বলেন

তিনি শৈবনন, শক্তিনন, বৈষ্ণব নন, বৈদান্তিক নন, অথচ তিনিই সবই।

তিনি করেন মূর্ত্তি পূজা, অথচ তিনি যাঁকে সচ্চিদানন্দ বলেন, সেই অব্যয় নিরাকার

অনন্ত আত্মার তিনি একজন বিশ্বস্ত ও পরম অনুরক্ত ধ্যাতা।

এই সেই ব্যক্তিত্ব নিজে কোন প্রচার করেন নি তাঁর আদর্শ বা মতবাদ এ ভারত বা বিশ্ব সমাজে

তাঁর হয়েই স্বামিজী করেন বিশ্বে পরিচিত, সেই নন্দিত ব্যক্তিত্ব লোকটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'দেবতা ও একদেবীর অবতার (৩৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

শাস্ত্রে বহুভাবে বহু রকমে আমরা ভজনা করতে পারি যার যার ইষ্ট দেবতাকে

তবে সখ্য প্রেম, কান্তাভাব, এ ভাবে ভজন মানুষের উত্তম পথ নহে।

উত্তম হতে পারে দাস্য ভাবে ভজন করা মনে হতে পারে কান্তভাবে ভজন

বা সখ্য ভাবে ভজন করা, মন কহে তবে উহা কখনও উচিত নয়।

মনুষ্যের মন কখন কি কহে না জানে ভবে মনুষ্য জাতি কভুও,

তাই স্মরণ রেখে সদা, মন কখন কি কহে না কহে করতে হবে ভজন।

মনের কথাই আমরা মানব জাতি চলি, ফিরি, দেখি করি সবই

এভবে, তাই তো মন বেটা কখন কি কহে ঠিক নেই তার।

তাই তো মনকে যত সাশন করি না কেন মন তো চলে উতালা

সাধুজন তা তো পারে না রাখতে ঠিক, মনের জ্বালা।

মন চাইছে যাহা তারা, যখন তখন তাই বলে মানুষ হয় তার গোলাম

মনকে বলতে তাই , কর মন তুই ভজ গুরু যখন তখন।

শুনবে না ও পারবে না শুনতে বা করতে তব নির্দ্দেশ নামা সফল, নানা

অজুহাতে করবে না সে তো ভজন, যার যার আদেশ মত।

তাই সময় থাকিতে হাতে, করতে হবে সাশন শক্তি হাতে কম বয়সে

হবে না তাই কেউ, তব মনের গোলাম, হবে মন, তব গোলাম।

শ্রীমাতৃভাবে শেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব (৩৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

সনাতন ধর্মে রামপ্রসাদ সেনের সম্পূর্ন ভক্তি গীতির মধ্যে মায়ের জন্য সন্তানের যে

ভাবাবেগ অভিব্যক্ত হয়েছে তা শ্রীকালী উপাসনার বাস্তবতা।

আমাদের দেশের মাতৃসাধকদের শক্তি পূজা হল, শিশুর মত সমস্ত অন্তর দিয়ে

ঈশ্বরীয় মাতৃভাবের পতি পরমানন্দে আত্ম নিবেদন বই কিছু নয়।

নারীর শক্তি ও প্রভাব ঈশ্বরীয় মাতৃভাবের প্রতীক, তাই নারীর সঙ্গে বন্ধর শারীরিক

কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, পুরুষের পক্ষে মাতৃভাব ছাড়া নারী জয় করা সম্ভব নহে।

নারী তাঁর মোহিনী শক্তি দিয়ে সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে দূরে

রাখে, নারীর প্রভাবমুক্ত হতে আপ্রান চেষ্টা করা ছিল শ্রীরাকৃষ্ণের আকাঙ্খা।

তাই এ মুক্তি সাধনায় নির্জন গঙ্গাতীরে তাঁর হৃদয়বিদারী ব্যাকুল আবেদন ও প্রার্থনা

বহুলোককে আকৃষ্ট করত, তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁরাও কাঁদতেন।

ইন্দ্রিয়ানুরাগ তাঁর কাছে ছিল আতঙ্ক তিনি তা জয় করতে হয়েছেন সফল কাম

তিনি উপাসনা করতে শ্রীকালীমাতাকে জানিয়েছেন সকল নারীই তাঁর এক একটি রূপ।

সে জন্য তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃজ্ঞানে সম্মান করতেন এমনকি ছোট্ট ছোট্ট বালিকাকেও

তিনি মাথা নীচু করে প্রনাম করতেন, ছেলে যেমন তাঁর মাকে পূজো করেন।

ঠিক তেমনি ভাবে নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজার আগ্রহ প্রকাশ করেন যাহা নারী জাতির

প্রতি তাঁর পবিত্র মনোভাব ও আচরন অতুলনীয় এবং শিক্ষাপ্রদ।

নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত আরাধনা স্বরূপ

যাহা সর্ববিশ্বে খ্যাত হয়ে রয়েছেন ও থাকবেন সদা সর্বদা।

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগে পরম প্রাপ্তি শ্রীরামকৃষ্ণের বানী (৩৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তুলানহীন নৈতিক চরিত্রের গোপন চাবি কাঠি হল কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা

প্রকৃত সাধুর পূজার অর্থ হল বিশুদ্ধতম নিঃস্বার্থ হয়ে প্রভুর সেবা করা।

মর্মস্পর্শী তিনি যে রাগভক্তি ব্যঞ্জক গান করতেন সেগুলোর মধ্যে করুন রসাত্মক গানও

রয়েছে, সেগুলো বুঝায়েদেয় আমরা প্রায়ই অমনোযোগা অথচ তাঁর কাছে জীবন্ত।

তাঁর কাছে ঐগান মরমী ব্যক্তি ধর্মনীতির নিদর্শন ও কঠোর সাধনাও তপশ্চয্যোর মাধ্যমে

ভক্তিযুক্ত ও অতীব বিস্ময়কর যার প্রকাশ সম্ভবপর নয় সর্ব সাধারনের।

তিনি অপূর্ব কন্ঠে গান করতেন যাহা অসাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ মন্ব্য ও পৌরানিক শাস্ত্রগুলির সবচেয়ে

দুর্বোধ্য অংশগুলির উপর অজ্ঞাতসারে অবিশ্বাস্য আলোকপাত করেন।

তাঁর বিগলিত জমাট বাঁধা গানের রস সেই রকম দেবতা ও মনুষ্যের আনন্দ বর্ধন করে

যেন ভয়ানক স্রোতে একখানা জীর্ণ কাঠের তরী বেয়ে চলে যাচেছ।

তিনি ভাবতেন শ্রীহরিতে বিশ্বাস থাকলে কোন কাঁঠা বা কাঁকর পায়ে আঘাত লাগবে না

এবং যে মাটিতে উত্তমরূপে প্রোথিত সেই খুঁটি ধরে ঘুরলে পড়বার সম্ভবনা থাকে না।

সেরূপ দৃঢ় নীতিতে না থাকলে গতি যতই ক্ষিপ্র হোকনা কেন আঘাত লাগে না

নীতি না থাকলে পদে পদে পতন নিশ্চিত, নীতি থাকবে, প্রসংশা চাই না।

কাম-কাঞ্চন জগৎকে পাপে ডুবিয়েছে তাই, স্ত্রীলোক বিদ্যাশক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান শক্তি

জগন্মাতৃরূপে নিরীক্ষণকালে স্ত্রী প্রলোভন মোটেই থাকে না।

ঈশ্বরই সত্য, আর সব মিথ্যা ধারনা পোষন পুত চরিত্র সদাশয় সাধু হিন্দু ধর্মের মাধুর্য্য

এ ধারনায় মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বানী ও ভাবনায় রেখে চললে পরমপ্রাপ্তি অবশ্যই।

স্বামী বিবেকানন্দজীর ঘোষনা “আমি ভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শ করেছি” (৩৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাসী ছিলেন না তাঁর সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্ন ছিল না মোটেই

তাঁর মত শিষ্য বৎসল কেউকে দেখা যায়নি, সকলের কাছে তাঁর আবেদন।

শ্রীঠাকুরের যে দিকটি লোকজনকে প্রচন্ডভাবে আকর্ষন করে তা হল তিনি কোন বুজরকিতে নেই

অলৌকিকতা কোন মানুষকে দেখাননি, কিন্তু কথামৃতের কথায় মানুষ চমকে যায়।

তার উপমা কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যায়, অথচ শ্রীঠাকুরের কাছে লোকজন আসলে

না হেঁসে পারতেন না, ঠাকুর মজার রসে রসিয়ে রাখতেন তাঁর ভক্তগণকে।

যদিও শ্রীঠাকুর গুরু হতে আগ্রহী ছিলেন না তবে যারা আসতেন তারা সবাই ঠাকরের কাছে

কিছু না কিছূ শিখতেন, তাই শ্রীঠাকুরকে চব্বিশ ঘন্টার গুরু বা আপন জন বলা যায়।

আমরা যাঁকে পান্ডিত্য বলি তার কিছুই তার না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব কথা

বলে গেছেন সে সব কথা তাঁর যুগে আর কেউ বলেন নি, বা কোন তথ্য নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ তাঁর বিভিন্ন ধর্মগত ঐতিহ্যে উপলব্ধ ঈশ্বর চেতনার প্রকাশ

প্রমানিত হয়েছে, যাঁর উপদেশ ঈশ্বরানুভূতি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত বলা যায়।

শ্রীঠাকর বিভিন্ন ধর্ম সাধনায় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে পরম সত্ত্বায় উপলব্দি করেছেন

যাহা স্বামী বিবেকানন্দজী ঘোষনা করেন “আমি ভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শ করেছি”।

ধর্ম বিশ্বাস মহামায়ার খেলার মত, যে কোন একটি পথ ধরতে হবে (৩৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের চন্ডি শাক্ত গ্রন্থ সেখানে দেবীর মহিমা বর্ণিত, এ দেবী পূজোতেই

সমাধি বৈশ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে মুক্ত আবার রাজা সুরথ অভীষ্ট রাজ্য লাভ করেন।

শুধু তা-ই নয় পরজন্মে সুরথ সার্বনী মনু হবার বর লাভ করেন, সেখানে দেবী প্রধানা

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শক্তিদ্বারাই পরিচালিত যথায় ব্রহ্মাস্ব করেছেন দেবীর।

নারায়ন স্বয়ং বিষ্ণু মায়ায় নিদ্রাভিভূত আর শিব শঙ্কর স্বয়ং দেবীর দূত হয়ে আছেন

আবার দেখা যায় শিব বুকে কালী, রাধাকৃষ্ণ যুগলবদ্ধ, রামসীতা একাসনে।

শিব গৃহিনী পার্বতী, ভগবানের শক্তি ভগবতী, নারায়নের ঘরনী লক্ষ্মী দেবী ইত্যাদি

তাঁদের বিবাহের ঘটকালী বর্ননা পুঙ্খানুরূপে বর্নিত রয়েছে সংস্কৃত পুরান সাহিত্যে।

দুই না হলে তো বিবাহই হয় না তাইতো দূর্গা আসেন বাপের বাড়ী

লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গনেশ ছেলে মেয়ে এক সংসার নিয়ে।

সাধারনের বিশ্বাস ঈশ্বরের অনন্ত লীলা তাই তাঁকে পূজো করলে বিপদাদি কাট্‌বে

সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হবে ইত্যাদি, এই বিশ্বাসেই চলছে এসব।

হিন্দুদের ধারনা আসলে একেরই বহুভাব প্রকাশ, ইহা লীলা মাত্র, এ ইন্ধন পাই পুরান সাহিত্যে

পুরান গ্রন্থাদিতে এ সবের লীলা বর্ননা আছে, তেমনি ঐক্যও আছে।

যাহা মহামায়ার খেলা, ধর্মের বিশ্বাস সেই মাহামায়ার যে কোন একটি পথ

ধরে এগুতে হবে, সেই বিশ্বাসেই সনাতন ধর্মীদের উদ্ধারের প্রধান রাস্তা।

শ্রীগুরুদেব প্রাপ্ত মন্ত্র সিদ্ধ করতে পারলে উদ্ধার নিশ্চিত (৩৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

"হরে নাম হরে নাম হরে নামৈব কেবলম।

হরে নাম হরে নাম কলৌ নাস্ত্বে, নাস্ত্বে, নাস্ত্বে গতির ন্যথা।।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কণ্ঠস্বর সঙ্গীত হতেও মধুর তিনি যখন মলিন মুখে ধীরে ধীরে আপন্মনের

কাহিনী বলতে থাকেন তখন সকলেই নীরব হয়ে শুনতে থাকতেন।

প্রভু উপরোক্ত শ্লোকটি পাঠ করে উহার ব্যাখ্যাও করলেন, যাহা এ ক্ষুদ্র শ্লোকের অর্থে কলিকালে

নাম ব্যতীত আর গতি নেই, শুধু "কষ্ণ নাম" জপ ছাড়া কলিতে উপায় নেই।

এ নামে কর্মবদ্ধ ক্ষয় পাবে, অধিকন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতি যে দূর্ল্লভ ধন কৃষ্ণ প্রেম তাহাও লব্য হবে

উপস্থিত সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ হরে নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে সকলে স্ম্ভিত।

মহাপ্রভু বললেন তিনি গুরুদেবের আজ্ঞা পেয়ে মন দৃঢ় করে "কৃষ্ণ নাম" জপতে লাগলেন

জপতে জপতে আমার মন ভ্রান্ হল, ক্রমে আমার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হল।

তখন আমি কখন হাসতে, কখন কাঁদতে কখন নাচতে, বা গাইতে লাগলাম

তখন ভাবলাম আমার, আমার একি দশা হল, এতো উন্মাদের অবস্থা।

তবে কি সত্যই পাগল হলেম, এ ভেবে আমার গুরুর শরনাপন্ন হয়ে তাঁর চরনে

নিবেদন করলাম যে, প্রভু আপনি আমায় কি মন্ত্র দিলেন ?

আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি "কৃষ্ণ নাম" নাম জপলেম জপতে জপতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ হয়ে গেল

এখন নাম জপতে, জপতে আমি হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই এ নাম জপে পাগল হয়েছি।

এখন ইহা হইতে মুক্ত হতে আমাকে উপায় বলে দিন, আমার কথা শুনে গুরুদেব হাস্য করতে শুরু

গুরুদেব বললেন, এ তোমার বিপদ নয় সম্পদ, তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে।

তাই ভক্তবৃন্দ আমরা যে যেখানেই দীক্ষা মন্ত্র প্রাপ্ত হইনা কেন, গুরুদেব থেকে প্রাপ্ত মন্ত্র

যুগে যুগে সকলেরই প্রাপ্ত গুরুমন্ত্র সিদ্ধ হলে উদ্ধার নিশ্চিত।

ভেবে চিন্তে দেখে শুনে বুঝে, ধরতে হবে শ্রীগুরু (৩৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

হচকিত মনে উল্লোশিত প্রানে করতে হবে, স্থির চিত্তে প্রাপ্ত হয়ে, গুরুমন্ত্র ধ্যান ধীর চিত্তে

প্রাপ্ত মন্ত্র সিদ্ধ হলে, ঈশ্বর চিন্তা বেড়ে যাবে মনে হবে হয়েছি পাগল।

এ পাগল নয়, সবই রইবে সঠিক, মন হবে উন্মত্ত ইষ্টপ্রেমে দর্শন হবে সব

অচেতন পদার্থ সকল চলছে মন বলবে সবের মধ্যে রয়েছেন তিনি।

এ প্রেমভাব পেতে আমার মত মানুষের কত সময় লাগবে জানেন স্রষ্ঠা ও

শ্রীগুরুজী, তাই কামনা আমার চাই আশীর্বাদ তাঁদের ও ভক্তদের।

পূর্ব জন্মের অর্জিত সম্পদ থাকে যদি সঙ্গে, তবে হতে পারি উদ্ধার এ ভবে

সঞ্চিত সঞ্চয় না থাকলে পরে অবশ্যই করে নিতে এ জন্মে অর্জ্জন।

এ সম্পদ অর্জিত না থাকলে পরে জেনে নিতে হবে শ্রীগুরুদেব থেকে

তাই তো গুরুজী হতে হবে, এ সবজ্ঞাতা ব্যক্তিত্ব নইলে উপায় কি ভবে।

বিদ্যালয়ে যেমনি শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিখান নিজে শিখে সর্ব বিষয়

তবেই ছাত্র হবে তাঁরই শিক্ষায় উত্তম ছাত্র হবে বটে।

এ পথের পথিক যেমনি হবে গুনধর, তেমনি হতে হবে তথৈবচ

এ না হলে যেরূপ শিক্ষক হবেন ছাত্র, আর গুরুবৎ শিষ্য।

মূলতঃ স্বামিজী বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা প্রচার করেন (৪০)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় ব্যাখ্যা অথবা এগুলো স্বামিজীর বিদেশীভাবে প্রসারিত নিজ ভাবধারা

স্বামিজীর কোন কোন গুরুভাই এর মনে জেগেছিল একদা সন্দেহ।

স্বামিজী তাঁদের বলেছিলেন কি করে জানবি তোরা এসব ঠাকুরের ভাব ধারা নয়

তোরা কি তোদের গন্ডিতে কুসিবন্ধ বন্ধ করে রাখতে চাস্ অনন্ ভাবধারার ঠাকুরকে।

আমি এ গন্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব, যা এজগতের লোককে

দিতেই আমাদের জন্ম, তিনি পেছনে দাড়িয়ে এসব কথা করিয়ে নিচ্ছেন।

তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ন হয়ে যাবে

সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে কতদূর বুঝেছে, প্রভু বাস্বিক অনেক উর্দ্ধে।

শ্রীঠাকুরই স্বামিজীর ভিতর দিয়ে ঐ কাজ করায়ে নিচ্ছেন, স্থুল শরীর থাকতেই

তাঁরা দেখেছিলেন ঠাকুরের আচরন ও বাক্যের মধ্যে কত গূঢ় অর্থ রয়েছে।

কত জটিল সমস্যার সমাধান স্বামিজী আবিস্কার করতেন যা ছিল অপরের ধারনার অতীত

দক্ষিনেশ্বরে একদিন অদ্ধবাহ্য দশায় ঠাকুর বলে ছিলেন “জীবে দয়া”।

তৎক্ষনাৎ দূর শালা। দয়া করার তুই কে ? না না জীবে দয়া নয় শিবজ্ঞানে জীব সেবা

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের কথা একঘর ভক্ত শুনলেন ও মাত্র স্বামিজীই প্রকৃত তথ্য বুঝেছিলেন।

ঘরের বাহিরে এসে গুরু ভাইদের স্ম্ভিত করে বলেন এ অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করব

পন্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মন ও চন্ডাল সকলকে শুনায়ে করব মোহিত।

অতএব, স্বামিজী সমস্ ভাবধারা স্বত্ত্ব মিশ্র রজোগুনাশ্রয়ী সেবাধর্ম ভাবনাও যে

শ্রীরামকৃষ্ণভাবেরই ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ তাতে সন্দেহের নেই কোন অবকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় সত্য যুগের আবির্ভাব (৪১)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত ভাবধারা এ যুগের সর্বপেক্ষা উপযোগী তাই সর্বাপেক্ষা বরনীয় বটে

স্বামিজী অন্য অবতারের তুলনায় খাটো করার জন্য ঠাকুরকে অবতার বরিষ্ঠ বলেননি।

শ্রীঠাকুরের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ পূর্ব পূর্ব যুগাপেক্ষা সমধিক বিকশিত হয়েছে সে বিকশিত

আদর্শের মহত্ত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সকলে পরিপূর্ণভাবে যেন বরন করতে পারে।

স্বামিজী নিজে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার ও অবতার বরিষ্ঠ বলে জানলেও এ মত অপরের উপর চাপাতে চাইতেন না

শিষ্যগণকে ঐ বিষয়ে সাবধান করে দিতেন, তাঁর শিক্ষা প্রচার করতে নির্দেশ দিতেন।

সর্বভাবের সমন্বয় শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি নব যুগধর্মের বৈশিষ্ট সূচক অসীম অনন্ ভাব

যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থেকেও এত দিন প্রচ্ছন্ন ছিল তা পুনঃ উচ্চ নিদানে ঘোষিত হচ্ছে।

সকলের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ ঈশ্বরবানীরূপ বেদের পরমজ্ঞানের এক একটি অধ্যায় বা পৃষ্ঠা সদৃশ

যাহা এক বেদের বহু শাখা, শ্রীঠাকুরের জীবন, সাধনা ও অনুভূতির আলোকে এই সত্য উদ্ভাসিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের অবির্ভাবের পর থেকে সত্যগুলি জগতে স্বীকৃতি লাভ শুরু করেছে, সেই দৃষ্টি ভঙ্গিতে

যথার্থই সত্য যুগের সূচনা হয়েছে, কারন ধর্মবিদ্বেষ, জড়বাদ, ভোগবাদ থাকা সত্ত্বেও নবযুগের উষা উন্মেষের সন্ধিক্ষণ।

জগতের সর্বত্র অধিক সংখ্যায় চিন্াশীল মানুষ দেবস্বভাবে বিশ্বাসী হয়ে সর্ব ধর্মের প্রতি

শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাবপোষন করছেন, যাহা সত্যযুগের আবির্ভাব সূচিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বহু প্রচারের ও প্রয়োগের দ্বারা সত্য যুগের পূনঃ আবির্ভাব

যে ত্বরান্বিত হতে চলছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শ্রীঠাকুর পুরুষকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ স্ত্রীদেরকে পুরুষ কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেন (৪২)

শ্রী অনিল মোহন কর।

ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম অনুসরন করে স্ত্রী শিক্ষায় সম্মত হয়

আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবুদ্ধি প্রধান শিক্ষা।

তাহা হৃদয় প্রধান শিক্ষা নহে, যাহা স্ত্রী জাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নয় বুদ্ধি প্রধান শিক্ষায়

নারীর অধিকার এখানে ব্রাহ্ম সমাজ নেতারা অস্বীকার সকলেই করেন।

এমন কি ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের মতো নেতাও নারীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ এবং তাদের

জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্স প্রভৃতি পড়বার প্রস্তাব সমর্থন করেননি।

শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন এ সকল পড়াইয়া এদের কি হবে, যেখানে প্রগতিশীল

সংস্কারকদের এ মনোভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি তথা কথিত শিক্ষায় বঞ্চিত তিনি আর কি বলবেন।

তাহলে যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই নারী বিদ্বেষী হতেন তবে স্ত্রী ভক্তদের বলেছেন পুরুষ কাঞ্চন

ত্যাগের কথা, দুঃখের বিষয় স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে কথোপকথন কেউ লিপিবদ্ধ করেনি।

এমনকি শ্রীমও তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সমস্ত কথোপকথন হয়েছে

তাহা কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখেননি যাহা শ্রীঠাকুর নারীদের অবজ্ঞা করেননি।

কোমল স্বভাবা রমনীদের শ্রারামকৃষ্ণ যে সমস্ত কথা বলে সতর্ক করে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে,

কোন কোন পুরুষ অশেষ আয়াশ স্বীকার পূর্বক তোমায় সহায়তা করতে আগ্রহী।

তাহলে কি তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করতে হবে অথবা কঠোরভাবে তার বক্ষে পদাঘাত পূর্বক

বলে এসে চিরকালের জন্য তার নিকট হতে দূরে থাকতে হবে?

তাই বুঝে যথন তখন যেখানে সেখানে যাকে তাকে দয়া করা চলে না

তাই অষ্টম অধ্যক্ষ বেলুড়মঠ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলেছিলেন ঠাকুরের স্ত্রী গ্রহন পুত্রৈষনার জন্য নয়।

স্ত্রীকে শ্রীঠাকুর দেখতেন সাক্ষাৎ জগন্মাতা রূপে তাই তাঁকে পুঁজো করে নারী জাতিকে মাতৃশক্তি প্রতিষ্ঠা

এছাড়া ভৈরবী ব্রাহ্মনা স্ত্রী গুরুর নিকট চৌষট্টি রকম তন্ত্র সাধনা শিখেন।

লোকভয়ে ভৈরবী মাকে রাতে গঙ্গার অপর পারে থাকার ব্যবস্থা ঠাকুর নিজেই করেছেন

এছাড়া হীনতম নারীর মধ্যে শ্রীঠাকুর জগজ্জননীকে দর্শন করতেন ও নারীকে তুচ্ছ করেন নি।

দক্ষিনেশ্বরে গদাই ঠাকুর পরিচিত হল শ্রীরামকৃষ্ণ নামে (৪৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

আসল আমার
দৃষ্টি পড়ল
মথর বাবুর তীক্ষ্ণ
নিত্য স্নানে গেলে,
শিব মূর্ত্তি গঙ্গায়
ব্যাপারটি কেমন,
করেন দৃষ্টি ছোট্ট
দর্শন রোজ রোজ
শ্রীকালী মায়ের,
মাকালীর কৃপাতে
গোপন সাধন,
ক্রমে বড়দা গেলেন,
দক্ষিনেশ্বর কালী
দৈবক্রমে এলেন,
কতকিছু আধ্যাত্মিক,
শিখান তন্ত্রাদি
প্রভু আমার, কহে
শ্রীরামকৃষ্ণদেব,

পাগলা ঠাকুর
শ্রীঠাকুরের প্রতি,
ছোট্ট ঠাকুরের প্রতি,
গঙ্গা মায়ের ঘাটে
বিসর্জন সঙ্গে সঙ্গে
কেমন ঠেকছে মনে,
ঠাকুরের প্রতি,
মনে পছন্দ বটে,
গলার মালা তৈরী
ধ্যান মগ্ন,
চলছে অর্নগল
চলে বাড়ী, নিযুক্ত
বাড়ীর, বেড়ে গেল
সেথায়, নেংটা
আইল আবার
চৌষট্টি ধারায়,
লোকে গদাই ঠাকর
পরিচিত করান বিশ্বে,

দক্ষিনেশ্বর মন্দিরে
রানীমার জামাতা
গড়েন শিব মূর্ত্তি
দেন পূঁজা গড়ে নিজে।
করেন লক্ষ্য মথুর বাবু
আরও রাখেন লক্ষ্য
বেড়ে গেল ক্ষেপা
করেন নিযুক্ত,
গদাই ঠাকুর দিয়ে।
না জানে কেউ,
হৃদয়ের অন্র বাহির।
হন, পূজারী মায়ের
নাম যশ পূজারীর,
ঠাকুর, শিখান
ভৈরবী ব্রাহ্মনী,
হলেন সিদ্ধ পুরুষ,
পরে সবাই বলেন,
স্বামিজী মহারাজজী।

পূরীধামের রথ হাতীতেও চলা ব্যর্থ হলে মহাপ্রভুর স্পর্শে রথ চলা শুরু (৪৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

রাজা প্রতাপচন্দ রুদ্রের ও মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে প্রভু হতে শক্তি নির্গত হয়ে রাজার প্রত্যেক ধমনী পরিস্কৃত হয়ে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আনন্দ লহড়ী ও সর্বাঙ্গে পুলক ভাবের উদয় হলো।

হঠাৎ প্রভু চেতন লাভ করে রাজাকে ফেলে রথ দর্শনে দৌঁড়ালেন, রাজা যেমন তেমনি পড়ে রইলেন এমনি সময়ে চন্দোদয় নাটকে গোপানাথ আচার্য রাজাকে উঠাতে গেল গজপতি স্থানে।

গোপীনাথ রাজাকে উঠায়ে সান্না দিচ্ছেন ওদিকে প্রভু ভক্তগণ উপবনে প্রত্যাগমন করেন রাজা দূর হতে প্রনাম করে কৃতার্থ হয়ে ভক্তগণ দলে এসে পড়েন।

তবে রাজার প্রতি অঙ্গে প্রেম তরঙ্গায়ন ও নয়ন দিয়ে অবিরত ধারা ঝড়ছে, সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করতে লাগলেন, রাজাও বিনীত ভাবে ভক্তগণ হতে বিদায় নিয়ে আসেন।

এসে প্রভুকে যত্ন করে পসাদ পাঠাবার উদ্দোগ করতে লাগলেন, একটু পরেই রাজার প্রদত্ত প্রসাদ উপহার দ্রব্য সার্ব ভৌম, রামানন্দ ও বানীনাথ প্রভুর সমীপে নিয়ে আসেন।

রাজার উপহার দ্রব্য অর্ধউপবন ভরে গেল উহার দর্শনে প্রভুও সন্তুষ্ট হলেন, কারন এই সব প্রসাদ জগন্নাথ দেব ভোজন করেন, তাই এই সুখে প্রভুর নয়ন জুড়ায়।

প্রভ স্বয়ং কেয়া পাতার দোনায় প্রসাদ পরিবেশন করতে লাগলেন, মনে হচ্ছে যেন আতিথ্য-ভার তিনি স্বয়ং গ্রহন করেছেন, সকলেই তখন প্রভুর কায্যকলাপে অবাক হয়ে দেখছেন।

পরে প্রভু ভোজনে বসলে স্বরূপ দামোদর, গোপীনাথ পরিবেশনে আকণ্ঠ ভোজ হলে, পরে দেখা গেল নানাবিধ সহস্র লোকের আহারীয়, উদ্ধৃত হলে প্রভুর আহবানে সহস্রেক কাঙ্গালী প্রসাদ পেলেন।

নারিকেল-শাসন-বনের ভোগকার্য সমাধা হলে গৌরীয়গণ আবার রথের দড়ি টানতে গেলেন কিন্তু রথ আর চলে না, তখন তারা প্রানপণ চেষ্টা করলেও রথ চলল না।

এদিকে রাজা প্রভুর কৃপা পেয়ে মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদি সমাপন করে আপন গৃহে বিশ্রামে গেলেন রথ না চলা বড় দোষের কথা, কোথাও না কোথা কিছু অপরাধ হয়েছে সকলে বলে।

অপরাহ্নে রাজা সংবাদ পাওয়া মাত্র পাত্র মিত্র সহ দৌঁড়ায়ে বড় বড় মল্লগণ এনে রথ টানতে নিযুক্ত করেন মল্লগণ ব্যর্থ হলে রাজা বড় বড় হাতী আনালেও ব্যর্থ হওয়ায় রাজার করুন অবস্থা।

তখন নিরাশ হয়ে রাজা করুন দৃষ্টিতে কাতর হয়ে প্রভুর পানে দেখতে লাগেন, প্রভুর নয়ন ভঙ্গী ব্যক্ত করে ভক্তগণ সঙ্গে করে হাতী রথ হতে ছাড়ায়ে রথের রজ্জ নিজ হস্তে দিলেন।

প্রভু নিজে রথের পেছনে মস্ক স্পর্শ করে রথ ঠেলতে লাগলে রথ অমনি গড়গড় করে চলতে লাগল তখন সকলে প্রভুর জয় চীৎকার করে ঘোষনা করল, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার যে চৌষট্টি মোহন্তের একজন প্রতাপ চন্দ্র রাজাও।

শ্রীভগবানকে সংসারের একজন ভেবে সংসার করা উত্তম (৪৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীবিষ্ণুপুরানে দেখা যায় যে, স্বধর্ম পালন করেন পরিনামে তা ভগবানে ভক্তি হয়

বিষ্ণুপুরানে আরও দেখা যায় হিন্দু ধর্মের ন্যায় উদার ধর্ম আর নেই জগতে।

খ্রীষ্টানেরা বলেন তাঁরা ব্যতীত আর সবে যাবে নরকে মুসলমানও সেইকথা তাঁরা ছাড়া অন্যেরাও নরকে

হিন্দুরা বলেন স্বধর্ম পালনের দ্বারা ক্রমে সবাই উদ্ধার পাবে।

স্বধর্ম পালনে ক্রমে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় আর তখন জীব উদ্ধার হয়ে যায়

শ্রীভগবান আছেন যে নামেই ভজন হয় না কেন ভক্তিতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

রাম রায়ের কথায় ভক্তি ও জ্ঞান এ উভয় যোগে যিনি আরাধনা করেন তিনিই প্রকৃত সাধক

জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তিতে বুঝায় যে, ভগবান জীবন মরনের কর্ত্তা, তাই না করলে ক্ষতি, করলে লাভ।

এ হিসেবে যিনি ভক্তি করেন, ভগবানকে তিনি প্রকৃত ভক্তি করেন না, স্বার্থের পোষন করেন

কিন্তু শ্রীভগবান প্রাপ্তি হয় জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারা, শ্রীগীতাতেও একই কথা।

শ্রীভাগবতেও জ্ঞান শূণ্য ভক্তি হতে আরম্ভ শ্রীভাগবত গ্রন্থের তাৎপর্য যে, ভগবান নিজ জন

তাই নিজ জন বোধে তাঁকে আরাধনা দ্বারাই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।

এক সময় ক্রীতদাস রাখার পদ্ধতি ছিল সেই থেকেই দাস্য ভক্তির কথাটা এসেছে

ক্রীতদাসের তো আর কেহ নেই জগতে, তাই প্রভুর সাথে থেকে সবাইর প্রতিই আকর্ষিত হয়।

তাই সেই দাসের প্রভুর প্রতি খানিক শ্রদ্ধা খানিক ভক্তি ও খানিক ভয় হয়ে থাকে

স্বাভাবিক ভাবে মানুষ সংসার, পেতে শ্রীভগবানকেও সংসারের একজন ভেবে ভালবেসে ভজনা করা উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ লোক কল্যানের জন্য আর্বিভূত (৪৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

বুদ্ধ, যীশু, মহাম্মদ ও চৈতন্যের মতো লোক শিক্ষকের আবির্ভাব সত্ত্বেও তাঁদের শিক্ষা জয় হয় নাই

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সামনে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বললে ঠাকুরের লোক শিক্ষার কথায় আকৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায় যতক্ষণ ব্রহ্মদর্শন না হয় ততক্ষন তার বিচার

ঘি কাঁচা থাকে যতক্ষন থাকে ততক্ষনই কলকলানি, যখন পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়ে আবার কলকলানি।

কারন পাকা ঘিয়ের কলকলানি থাকে না আর তেমনি, সমাধিস্থ মানুষ লোক শিক্ষার জন্য যখন

নেমে আসেন আবার তখন কথা কয়, সেই সমাধিস্থ পুরুষ, শ্রীঠাকুর নেমে এসেছিলেন।

কথা বলেছিলেন ছেট বড়, উচ্চনীচ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের সঙ্গে সাধারণ ভাষায় অসাধারণ ভাবে

তবে ভেক ধারন করে কোন প্লাটফর্মে দাঁড়ায়ে বাবু সেজে লেকচার তিনি দেন নি।

সাধারণ খাট ধূতি পরে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে কখনও তক্তপোশে বসে কখন বা মেঝেতে বসে

সবাইর সঙ্গে মিশে গিয়ে কথা বলছেন, গল্প করছেন, গান শুনাচ্ছেন।

তাঁর পক্ষেই তা করা সম্ভব ছিল, কারন তিনি ছিলেন নির্দ্দেশ প্রাপ্ত সৃষ্টিশীল লোক শিক্ষক

গান, মূর্ত্তি গড়া, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন সৃষ্টির জগতে তাঁর ছিল উল্লাস।

তিনি মানুষের কল্যানের জন্য জগতে আর্বিভূত লোক শিক্ষক রূপে তাঁর মধ্যেই মানব দরদীর মোহনা করেছিলেন

তিনিই প্রথম মানুষ যিনি রস এবং যশের কথা একই সঙ্গে উচ্চারন করেছিলেন।

ভক্তের প্রার্থনা শ্রীশ্রীমা দূর্গা দেবীর প্রতি (৪৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

ভূবন মোহিনী মা, তুমি করুনাময়ী বন্দি তোমায়,

তুমি মহাবিদ্যা, আদ্যাশক্তি মুক্তিগেহেনী মা।

তুমি অহং ত্যাগিনী মা জগৎ জনের রিপু দমনী

তুমি আদি মা জননী, কৈলাসবাসিনী।

আমি কাঁদি মা দুহাত উঠায়ে তোমাপ্রতি

তোমাকে মা দেখলে চমকে উঠি আমি মা।

সংসারের দোলনাতে আমি তোমায় ভজনা করে

মরি আমি ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে তুমি কোথা গেলা।

খাবার না দেস মা, মা তোমার শ্রীচরণ তো দর্শন করি

তোমার ঐ রাঙ্গা চরন দর্শনে মা ক্ষুধা যাবে চলি।

আশীষ দাও মা আমায়, তোমাকে যেন না ভুলি

দাওমা দাওমা তোমার সুভাসিত শ্রীচরন দুখানি।

শতরূপিনী দেবী এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টিকারিনী (৪৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

তুই মা কালী, দূর্গা, মহামায়া, ভগবতী তোর শক্তিতে

শক্তিশালী, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি তোরই শক্তিতে শক্তিশালী।

তুই মা জগতের ঈশ্বরী, তোর উপাসকের ফল দাত্রী

তুই মা সর্বাধার পরমাত্মার জগৎ পিতাকে প্রসব করেছিস।

তুই মা পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মা সর্বদেব গুনান্বিতা

ত্রিগুনময়ী সকলের আদ্যা প্রকৃতি পরমেশ্বরী দেবী।

তুই মা বিশ্ব জননী, তোর শক্তিতে সর্বময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী

তুই মা, মহামায়া যোগমায়া নেই তোর জন্ম মৃত্যু।

তুই মা নিত্যকাল বিরাজিতা আরও তুই মা

চিতি শক্তিরূপে, জগদব্যাপ্ত করে বিরাজিতা জননী।

তুই মা প্রসন্না হলেই মোক্ষদ্বার কপাট উন্মোচনকারিনী

মা তুই সমগ্র শ্রী ঐশ্বর্যধারিনী দেবী দূর্গা।

মহিষাসুরকে পরব্রহ্ম মহিষী মহাশক্তিতেই বধকারী

প্রনমী তোমায় মা তুমি জগন্মুক্তি জগদ্ধাত্রা রূপী অধিষ্টাত্রী দেবী।

শ্রীবৃন্দাবনে যেতে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রোদন বর্ননা (৪৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীমহাপ্রভু নিমাই যখন মাথা মুন্ডন অবস্থায় তখন পুরুষোত্তম আচার্য্য ভাবেন এরূপ নির্দ্বয়

প্রভুকে ভজন করতে নেই, কারন কার্য্য উদ্ধারের জন্য এরূপ মর্মে আঘাত হানতে নেই।

তাকে বুদ্ধিমান লোকের মন প্রান সমর্পন করতে নেই, ইহা ভেবে পুরুষোত্তম ক্রোধ করে

যে, দেশে নিমাইয়ের কথা নেই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তি মার্গকে ঘৃনা করে তথায় যাবে না।

তাই বারানসীতে দ্রুত বেগে গমন করে শ্রীনিমাই এর বিরুদ্ধে মত অর্থাৎ আমিই তিনি

এই ধর্ম অবলম্বন করে সন্ন্যাস করেন যিনি, তিনিই স্বরূপ দামোদর।

যিনি প্রভুকে সর্বান্তঃকরনে জানতেন তিনিই পূর্ন ব্রহ্ম সনাতন ও ত্রিভবনবাসী সকলের কর্ত্তা

তিনিই ক্রোধ করে সেই প্রভুকে ত্যাগ করেন, এ কর্ম মনুষ্য করতে পারে, তা কারো বিশ্বাস্য নয়।

কলহ ও প্রীতি এ দুটি এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম, যথায় কলহ নেই

তথায় প্রীতির সহিত একটু ভক্তি মিশানো থাকে, পতি পত্নীতে অতি প্রেম থাকে।

যেখানে একে অন্যের অতিশয় ভক্তি করে মনে মনে আপন অপেক্ষা বড় মনে করে

শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব, কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে দেয়।

এখানে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, এই প্রেম কলহে প্রীতির বন্ধন হয়, বিষয়টি সকলেই জ্ঞাত

শ্রীনিমাই ক্রমান্বয়ে সন্ন্যাসের পরে শ্রীবৃন্দাবনের পথে চলতে কখনও বিপরীত পথে যাওয়া কখনও মুচ্ছিত হন।

মুর্চ্ছা ভঙ্গ হলেও জ্ঞান লাভ না হলেও দৌড়াতে থাকেন, ভক্তগণ ক্লান্ত হলেও প্রভুর ক্লান্তি নেই

এভাবে একদা সন্ধ্যার পূর্বে নিত্যানন্দও প্রভুকে হারায়ে সারারাত সকলের আহার নিদ্রা নেই।

সারানিশি সকলে বসে আহার নিদ্রা বিহীন হঠাৎ তাঁরা ভোর রাত্রি দিকে কাতরানি শব্দ শুনেন

ঐ শব্দ যাহা স্ত্রীলোক বিনায়ে বিনায়ে কাঁদুনির করুন স্বরে কৃষ্ণ আমায় দর্শন দাও হে।

প্রভুর কাঁদার স্বরে নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ পৌঁছে এক গাছ তলায় শুধু কৌপান পরা অবস্থায়

প্রভুর অবস্থা দেখে নিজগতের এমন কারো সাধ্য নেই যে স্তম্ভিত ও পুতুলের ন্যায় হবে না।

নসীরাম নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক ও যোগামূর্ত্তির সন্ধান (৫০)

শ্রী অনিল মোহন কর

নসীরাম নাটকে গিরিশ চন্দ্র সচেতন ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণর সংলাপ বাগনীতি চরিত্রবৈশিষ্ট্য সুনিপুনভাবে উপস্থাপন করেছেন, নসীরাম একটি ভগবদ্ভাবা মূলক নাটক।

এ পরিচয়েই নাট্যকারের অভিপ্রায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত, নসীরাম বহিরঙ্গে অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমিক কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন ও কৃষ্ণ প্রেম বিতরনই তার জীবনোদ্দেশ্য মাত্র।

“জগৎকে প্রেমদে - যে হীনের হীন, তাকে প্রেমদে রাই বাজারের ঘরের প্রেম ফুরাবে না, যতপার-বিলাও, নসীরামের দষ্টিতে মানুষের সুখ দুঃখ বিধাতার পুতুল বাজী।

তার করে নাচাচ্ছে, আর নাচ্ছে তার দার্শনিকতা অন্যের চোখে পাগলামি কিন্তু নসীরাম আনন্দোলোকের সন্ধান পেয়েছে, তার কাছে মায়াচ্ছন্ন মানুষের আচরনই বিসদৃশ।

পাঁচ বেটাতে যা বলে, তাই তো নাম আমায় যেমন নসে পাগলা বলে তোমায় তেমনি বিশে পাগলা, কি অন্য পাগলা বা আরেকটা বলে।

লোকের কি, শালাদের আমি দেখি, যে বেটারা তাদের মনের মত পাগল না হয় আপনার মজায় থাকে, তারেই বলে পাগল, এ পাগলরা কখন কি করে কে জানে।

যেমন কোন শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মাণের পাগল, কোন শালা মেয়ে মানুষের পাগল কোন শালা ছেলের পাগল কাঙ্গাল, যে শালা কেউ কেঙ্গলাবৃত্তি না করে , সে শালাই পাগল।

কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র নসীরামে প্রাধান্য পেয়েছে, পূর্ন চন্দ্র নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক ও যোগি মূর্ত্তির সন্ধান পৃথিবীর কার্য্য শেষে স্বধামে যাহার পূর্বে এ বানী ঃ

“সংশয় রহিত চিত্ত যেই জন হয়,
কামিনী কাঞ্চনে তার নাই ভয়,
যোগ যাগ তপধ্যান, বাহ্য আচরন
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ যোগীর লক্ষন”।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামিজী বহুমূখী জ্ঞানের আধারে পরিপূর্ন (৫১)

শ্রী অনিল মোহন কর

এক সময় নরেন্দ্র নাথ পরে স্বামিজী থিয়েটারে

সাজ ঘরে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর লঘু চপলতার মধ্যে ভজন করেছেন।

মুহুর্তে পরিবর্ত্তন হয়েছিল সেখানকার আবহাওয়া

আর ক্রমান্বয়ে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে লোক লোকান্তরে অভিযাত্রার মাধুর্যে।

থিয়েটারের গানই এক এক সময়ে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে

শরনাগতির মন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন, যা তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ বলেছিলেন।

ঐ সময় চৈতন্য লীলার গান নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে

যাহার রাধা বই আরা নইকো আমার, রাধা বলে বাঁজাই বাশী।

রাতে বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ এই গানটি প্রানের ভিতর থেকে

নিজের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, অতি মধুর স্বরে।

যথা- জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই এই গানটি।

নরেন্দনাথ নিজের অন্তর থেকে গাইতেছিলেন।

সঙ্গীতকালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল

চারিদিক থেকে প্রবাহিত যাহা প্রত্যক্ষ কি একটা ভাব উঠত।

আবার বুদ্ধদেব চরিতের গানটি নরেন্দ্র নাথের কণ্ঠে

“ছাড় মোহ, ছাড় দাও রে কুমন্ত্রনা জপ তারে যাবে যন্ত্রনা।

এক শিব রাত্রিতে বরাহনগরে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে

ভক্তমন্ডলী “দক্ষ যজ্ঞ” “নাটকে নাচ বাহু তুলে” ভোলা ভাবে ভুলে গেয়েছেন।

তাই নরেন্দ্রনাথ দত্ত পরবর্তীতে স্বামিজীর নাই হেন কোন

সুকুত্তি যাহা প্রমান করেছে নাচ, নাটকের গানে ও জ্ঞানের আধারে।

মহাপ্রভুর সঙ্গে ভারতের প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের আলোচনা পত্রে (৫২)

শ্রী অনিল মোহন কর

ভারতের তখনকার প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ দশ সহস্র সন্ন্যাসী লয়ে কাশীতে বিরাজ করছেন

ভাবুক সন্ন্যাসী চৈতন্য সার্বভৌমের ন্যায় প্রবল পন্ডিতকে মুগ্ধ করে তাঁর সর্বনাশ করছেন।

ইহা ভেবে তিনি প্রভুকে দন্ড দেবার অভিপ্রায়ে নীলাচলে একটি যাত্রী দ্বারা প্রভুর নিকট শ্লোক পাঠান

সেই শ্লোকটি এই যে, স্থানে মনি কনিকা ও পাপনাশিনী মন্দাগিনি দীঘিকা।

সেই স্থানে মহাদেব তারক মোক্ষপদ দেবগণের অগ্রবর্তী নির্বান পথস্থিত রত্ন প্রদান করেন

মূঢ়গণ সেই প্রকৃত রত্ন ত্যাগ করে, পশুরা যেরূপ মৃগ তৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয়।

প্রভু প্রকাশনানন্দের পত্র পেয়ে সুখ পেলেন না তবু প্রকাশানন্দের সম্মানার্থে উত্তর স্বরূপ

শ্লোকে জবাব পাঠালেন- মনি মনিকা ভগবানের ঘর্মজল ও ভাগিরথী ভগবানের চরনবারি।

কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাতে বিলীন হয়ে ভজনা করছেন ও বারানসী যাহার নাশ

নিস্সার তারক, অতএব হে সখে, শ্রীকৃষ্ণের নির্বান পদ চরন কমল তাঁকে ভজন কর।

প্রকাশনানন্দ এই উত্তর পেয়ে চটে উঠেন তখন প্রভু যে জগন্নাথ প্রসাদকে উপেক্ষা করেন না

একথা লয়ে গালি দিয়ে আরেকটি শ্লোকে জবাব প্রেরন করেন।

যাহা বিশ্বমিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল মাত্র ভক্ষন করেও মনোহর

শ্রীমুখ দর্শন করে মোহপ্রাপ্ত হন যে মানবগণ ঘৃত, দধি, দুগ্ধ পান করেন।

এবং ধানের অন্ন ভক্ষন করে, তারাও যদি ইন্দ্রিয় নিগৃহ করতে পারেন, তবে চটক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্গল উঠতে পারে

প্রভু এ শ্লোক দেখে উত্তর প্রয়োজন করে না প্রভু বলেন, কিন্তু ভক্তগণ ছাড়লেন না।

প্রভুকে গোপন করে তারা ঐ শ্লোকের উত্তর পাঠালেন যাহা বলবান সিংহ হস্ত শূকর ইত্যাদির মাংস ভক্ষন

করেও বৎসরে একবার মাত্র ক্রীড়া করে, কপোত সামান্য বস্তুর কনা ভক্ষন করে নিয়ত ক্রীড়া করে এর হেতু কি?

প্রভু বিজয়া দশমী দিনে বৃন্দাবনে যাত্রা করার সময় কুলীন গ্রামবাসীরা বৈষ্ণব কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করেন

প্রভু পরিস্কার উত্তরে বলেন বৈষ্ণব তিন ভাবে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম, তবে যাদের দর্শনে কৃষ্ণনাম আসে তাদের বৈষ্ণবতর জানবে।

অন্যান্য অবতারগণের ন্যায় রাজ শক্তি প্রচার করেননি শ্রীরামকৃষ্ণ বানী (৫৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

বিশ্ব ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ লোক থেকে লোকে আপনাকে প্রসারিত করে ইতিহাসের পর অভ্যুত্থানের উদয়াচলে স্থির মূর্ত্তিতে তিনি দাঁড়ায়ে রয়েছেন।

স্বামিজী এই ঐতিহাসিক বাস্বতার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন যে, শ্রীঠাকুরের দেহ ত্যাগের পর দশ বছরের মধ্যেই এ শক্তি জগৎব্যাপী পরিব্যপ্ত করেছে।

স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বামিজী এও জানিয়েছিলেন যে, তাতেও তাঁর বানীতে আধ্যাত্ম্য বন্যার ধ্বনি শীঘ্রই ভারতে ঝাপটে পড়বে তার অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ রক্ষার পর গত একশত বছরে স্বামিজী উক্তির যথার্থতার আবাস মিলছে ভারতে ও পৃথিবীর সর্বত্র তিনি স্মৃত, পূজিত, বন্দিত শহরে ও গামে গিরি গুহায় ও মরু অঞ্চলেও।

আর কোন অবতারে এমনটি সম্ভব হয়নি যতক্ষন না রাষ্ট্র শক্তি প্রচারের ভার নিয়েছে ততক্ষন কোন অবতারের প্রভাব ভূখন্ডের সীমা অতিক্রম করেনি।

রামচন্দ্রের ছিল অযোধ্যা রাজ্য, কৃষ্ণ ছিলেন যুধিষ্টির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাভারতীয় রাষ্ট্রের আরাধ্য দেবতা, মৌর্য সাম্রাজ্য দায়িত্ব নিয়েছিল বুদ্ধের বানী প্রচারের।

রোমান সাম্রাজ্য রাষ্ট্র ধর্মরূপে খ্রীষ্ট ধর্মকে বরণ করার আগ পর্যন্ বিশ্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি খ্রীষ্টধর্ম, মহম্মদ নিজেই রাষ্ট্র নির্মাতা ছিলেন।

চৈতন্যের সেবক ছিলেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, কিন্তু বিশ্বের কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রাষ্ট্র শ্রীরাকৃষ্ণের নাম, বানী বা উপদেশ প্রচারের দায়িত্ব নেয়নি।

শ্রীঠাকুরের কোন রাজবৃত্তের লোক ছিলেন না ইংরেজের রাজ সভায় কোন দিন উপস্থাপিত হয়নি কিন্তু বুদ্ধদেব সে কালের রাজ সভাগুলিতে যেতেন, শ্রীঠাকুর যেতেন ভক্তের গৃহে আমন্ত্রন বা বিনা আমন্ত্রনে।

তাই ভক্তের রাজা হয়েই তিনি বিরাজমান ভক্তের কোন জাতি নেই, তারা যেন নূতন প্রজাতি লোকয়াত লোকব্যাপ্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপীঠ ভক্ত হৃদয় তাঁর বানী করেছে সর্বজনকে প্রবোষ্টিত।

পুরীধামের পথে পাটনী ঘাটের মাঝি মহাপ্রভুকে ঘাট পার (৫৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

মহাপ্রভু পুরীধামে উড়িষ্যার পথে পাটনীরা যাত্রীদের বড় উৎপাত ও অত্যাচার করত প্রভু গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন ইত্যাদি পার হয়ে গেলেন বটে পাটনীর হাতে ধরা পড়েন।

পাটনী ঘাটের রাজা পার করে যাত্রীদের অনায়াসে, যাত্রীগণকে প্রহার, বন্ধন ও লুণ্ঠন ইত্যাদি যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করতে পারে, এরা ছোটলোক অথচ অপার ক্ষমতা সম্পন্ন।

প্রভু উড়িষ্যার অন্যকে কি ভব সাগর পার করবেন প্রথম যাইয়াই ঘাট পাড়াপারের মাঝির ঝগড়া বাঁধল তারা ছয়জন পার হলে দান চাই অথচ কারো কাছে কপর্দক মাত্রও নেই।

খেওয়ারিই বা বিনা কড়িতে কেন পাড় করবে সঙ্গে কিছু দ্রব্যাদি থাকলে কেড়ে নিত কিন্তু নেইকিছ মাঝিকে কাহার ও ফাঁকি দেবার যো নেই, আগে কড়ি পরে পার, এ হল নিয়ম।

মাঝি, প্রভুকে ডাকল, সঙ্গীদের ডাকল না, বলল এ দিকে এসো না, এই বলে মাঝি প্রভুর দিকে চাইল প্রভুর মুখের তেজ দেখে মাঝি ভয় পেয়ে এর থেকে কড়ি নেব না, যারা সঙ্গে তাদেরকে নেব না।

ইহা ভেবে প্রভুকে ডাকল সঙ্গীদের মাঝি ডাকল না কিন্তু প্রভু মাঝিকে বলল, মাঝি ভাই, ত্রিজগতে আমার কেহ নেই এ কথা বললে, মাঝি প্রভুকে আসতে বলল কিন্তু সঙ্গীদেরকে আসতে দিল না।

প্রভু ঘাটের কাছে এসে বসে দুই জানুর মধ্যে মস্ক রেকে জগন্নাথ আমায় দর্শন দাও বলে রোদন করতে লাগেন, প্রভুর কান্ড দেকে ভক্তগণ হেসে উঠল পরক্ষনেই চিন্া সাগরে ডুবলেন।

প্রভুর স্ত্রীলোকের মত বিনায়ে বিনায়ে কাঁদা শুনে নিষ্ঠুর মাঝিরও হৃদয় দ্রব হল, তখন মাঝি উৎসুখ হয়ে নিকটে নিত্যানন্দকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল উনি কে? এত কাঁদছে কেন?

তখন নিত্যানন্দ বলছেন শুন নাই উনি অবতার, স্বয়ং ভগবান, এখন সন্ন্যাসী হয়ে জীব উদ্ধারের জন্য নীলাচলে আমরা সকলে তাঁকে রক্ষা করতে সঙ্গে চলছি।

মাঝি তখন প্রভুর চরণে পড়ে বলল কোটি জন্মের পূন্য ফলে আজ তোমার চরণ দর্শন করে সমুদয় বন্ধন মোচন হল, আর সকলে নৌকায় উঠে হরি হরি বলে পাড় হলেন।

সারা জীবন ইষ্টদেবকে ভজন করলে মৃত্যুকালের ডাকে আসবেনই (৫৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

কোন কোন পন্ডিত লোক মনে করেন সৃষ্টি প্রক্রিয়া আপনি হয় অর্থাৎ নিসর্গই সৃষ্টি করে থাকেন শ্রীভগবান বলে আর কোন পৃথক বস্তু নেই।

জ্ঞানী লোকের কথায় দুঃখ নেই তাঁরা এও বলেন, স্বভাবের সৃষ্টিতে জটিলতা নেই স্বভাব যেমন অভাব দিয়েছে, তেমনি অভাব দূর করার বস্তুও দিয়েছেন।

যেমন পিপাসা আছে তেমন জলও আছে যেমন ক্ষুধা আছে তেমনি অন্ন দিয়েছেন শিশু জন্মাবার আগে মাতৃদুগ্ধ সঞ্চয় করে রেখেছেন অর্থাৎ স্বভাবে সৃষ্টি।

আর সেই সৃষ্টি যদি ভুল না থাকে তবে আমি কখনও মরব না, হে কৃষ্ণ দর্শন দাও, নতুবা প্রানে মরব এ সমূদয় ভাব তিনি দিলেন কেন?

মরে বিলুপ্ত হয়ে যাব, জীবে ইহা ভাবতে পারে না, স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহা দ্বারা প্রমানিত হবে যে, জীব বিলুপ্ত হবে না।

যদি ভগবান না থাকতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব আসতে দিতেন না যদি স্ব স্ব ইষ্টদেবকে পাবার সম্ভাবনা না থাকত তবে ইষ্ট দেবের প্রতি লোভ দিতেন না।

স্বভাব লোভ দেবে, লোভের বস্তু দেবে না ইহা অসম্ভব, মাধবেন্দ্র পূরী প্রাণ ত্যাগের পূর্বে কৃষ্ণ দেখা দাও, প্রাণ যায় বলতে বলতে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

তাই স্বভাবের দৃষ্টিতে যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি করবেন তা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখে রেখেছেন, গো বৎস হাম্বা হাম্বা রবে ডাকে।

তখন তার দুগ্ধবতী জননী, ডাক শুনা মাত্র হাম্বা বলে উত্তর প্রদান করে দৌড়ে আসে যেমন মাধবেন্দ্র পূরী প্রাণ ত্যাগ কালে কৃষ্ণ বলে ডাকলেন তখন কৃষ্ণও আসবেন।

ভাগী নদীর নাম হল মহাপ্রভুর দন্ড ভাঙ্গায় দন্ডভাঙ্গা নদী (৫৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

মহাপ্রভু চলার পথে ভূবনেশ্বর গণ সহ আসলেন ভূবনেশ্বরের ন্যায় সুন্দর মূর্ত্তি জগতে আর নেই

ভূবনেশ্বরের শিবস্থান কাশীর বিখ্যাত, তাই ইহাকে গুপ্ত কাশী বলে।

প্রভু সেথায় শিবের বৈভব দেখে বড় সন্তুষ্ট হয়ে শিবের অগ্রে নৃত্য করে প্রভুর আবেশ

শরীর টল্‌মল্‌ করলে স্থির থাকতে পারলেন না, ক্রমে কমল পূরে আসলেন।

প্রাতে বিন্দ সরোবরে স্নান করে কপাতেশ্বর শিব দর্শন করতে বললে নিত্যানন্দ গেলেন না

তখন জগদানন্দ প্রভুর "দন্ড" বাহক না গিয়ে দন্ডখানি নিত্যানন্দকে দিয়ে ভিক্ষায় গেলেন।

নিত্যানন্দ দন্ড নিয়ে ভাগা নদীর তীরে বসলেন, গৌর কাছে নেই, তাই দন্ডের সহিত

কথা কইতেছেন দন্ড তোমার মত আমার দন্ড ছিল তবে ভেঙ্গে ফেলেছি।

এখন তোমাকে ভাঙ্গতে পারলে আমার মনের দুঃখ যায়, দন্ড, আমি প্রভুকে বহন করি হৃদয়ে

সেই ঠাকুর তোমাকে বহন করে, তোমার এ স্পর্দা কেন? এখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গব।

যে প্রভু বংশী হাতে ত্রিজগৎ মোহিত করতেন সেই বংশী দন্ড হয়ে তাঁকে বৃক্ষতলবাসী

কাঙ্গাল করেছে, আজ "দন্ড" তোমায় আমি দন্ড দেব, আমরা সকলে তাঁর সন্ন্যাসে ব্যথিত।

তাই নিত্যানন্দ দন্ডটী পেয়ে ছাড়বেন কেন? প্রকৃতই দন্ডটি ভেঙ্গে জলে ভাসায়ে দিল

জ্ঞানী লোকে বলে দন্ডটী বিধির প্রতিরূপ, ভগবান বিধির ভৃত্য নহেন।

তিনি তার বাহিরে, তাই নিত্যানন্দ ভেঙ্গে দিন খন্ড করে জলে ভাসায়ে দেন

বিধি ধর্ম ও প্রেম ধর্ম পরস্পর বিরোধী, নিতাই প্রেমধর্মের পক্ষপাতী ও ফলোয্যভোগী।

দন্ড ভেঙ্গে নিতাই মনে সাহস বাধতে থাকেন প্রভু যদি ক্রোধ করে, তবে প্রভুর সাথে ঝগড়া করবেন

সেই হতে ভাগা নদীর নাম হল দন্ডভাঙ্গা নদী।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন সঞ্জীবনী কথা শিল্পী (৫৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

বাংলায় একটি প্রবাদ তল্য বাক্য চালু আছে কালি, কলম, মন লেখে তিন জন

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কথাটা অন্য আখরে খাটে ভাবন, জীবন মন লেখে তিন জন।

জীবনটা তাঁর কাছে কালি, জীবনও কাগজ আর মনটাই ছিল সেই অদৃশ্য কলম

জীবন খাতার শুন্য পাতায় মনঃ সংযোগ করে তিনি যে অক্ষর আঁচর টেনেছেন সেটাই চির কালের লেখা তাঁর।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন “সঞ্জীবনী কথা লিল্পী” এরকমই এক লোকোত্তর প্রতিভার লেখক ছিলেন

তাঁর আগে বা সমকালে এমন মানুষ জন্মাননি আর জন্মাবেন এমন সম্ভাবনা নেই।

তিনি ছিলেন সে কালের এক শ্রেষ্ঠ কবি গ্রন্থকার ও নাট্যকার, এক অত্যাশ্চর্য বাতাবরণ সাহিত্য

সষ্টি করেছিলেন বস্তুতঃ এক অবতার তূল্য সিদ্ধ সাধক হয়েও শাস্ত্র সংহিতার জনক ও গনদীক্ষা গুরু।

তাঁর অভিনয় রূপ ছিল একাধারে মহা বর্ষনকারী কথকের, শব্দভেদী কবির ও সব্যসাচী নটোবর

তাঁকে কাগজ কলমে লিখতে হয়নি, অথচ তিনি লেখক ছিলেন।

বাঙ্গালীর ভাব জীবনের রঙ্গ মঞ্চে জন্ম হল এক অকল্পনীয় নাটকের যার নট ও নাট্যকার

একই ব্যক্তি, এক লৌকিক ব্যক্তিত্ব, বিভ্রান্ত এবং অবিশ্বাসী মানুষের মহিমা বিচ্ছরিত হল।

বাঙ্গালীর অন্র বিপ্লব শুরু হয়ে গেল এই সহজিয়া মানুষটির সাধনা সমন্বয়

সমীকরনের পথে বাঙ্গালীর মার্গ সাধনার পথকে সুগম করে দিল।

দূরুহ দূর্গম ধর্মক্ষেত্রকে তিনি নূতন চেহারায় প্রতিষ্ঠিত করলেন সংসার ক্ষেত্রের মধ্যে

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তেমনি বাংলা সাহিত্যকে নাড়া দিল অভাবিত রকমে।

মহাপ্রভু নিজ স্থান বৃন্দাবনে পৌঁছে স্বরূপ ধারন (৫৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

কাশী ও নদীয়া ভারত বর্ষের দুই প্রধান স্থান নদীয়া ন্যায়ের স্থান, কাশী বেদের স্থান নদীয়ায় তন্ত্র চর্চা আর কাশীতে জ্ঞান চর্চা বিপুল পরিমানে হয়ে থাকে। নদীয়া গৃহী পন্ডিতদের ও কাশী সন্ন্যাসী পন্ডিতদের স্থান, সন্ন্যাসীদের সর্ব প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী ন্যায় শাস্ত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড় কিন্তু সরস্বতী বেদে সার্বভৌম অপেক্ষা বড়। মহাপ্রভু ও সরস্বতীতে বেশ জানা শুনা আছে মহাপ্রভু কাশিতে আসলে সে কথা প্রকাশিত হল এক অপূর্ব সন্ন্যাসী কাশী এসেছেন দেখলে শ্রীকৃষ্ণ মনে হয় বলাবলি হত। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মন কাশীতে সন্ন্যাসীগণের সহিত ইষ্ট গোষ্ঠী করেন তিনি প্রভুকে চিত্ত সম্পন্ন করে কাশীর সর্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সংবাদটি জানান যে মানুষটি যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। খবরটি জেনে বলেন লোকটির নাম চৈতন্য সন্ন্যাসী সে ঘোর ঐন্দ্রজালিক, শুনেছি পন্ডিত সার্বভৌম নাকি তাঁকে ঈশ্বর মনে করেন, তার ভাব কাশীতে বিকাবেনা, তুমি সাবধান, সেথায় যেওনা। ঐ বাহ্মন প্রকাশানন্দের সমস্ ভাবকালা মহাপ্রভুর কাশীতে বিকাবে না মন্ব্য শুনে প্রভু ঈষৎ হাসেন এবং বলেন, ভারী বোঝা লয়ে এসেছি, যদি না বিকায় অল্প মূলে ছেড়েদেব নতুবা একবারে বিলায়ে দেব। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মন বলেন, সে আপনাকে জানে দেখলাম আপনার উপর খুব রাগ এমন কি আপনার নামটা পর্যন্ সহ্য হয় না, তিনবার বলল চৈতন্য কিন্তু কৃষ্ণ চৈতন্য বলল না। মহাপ্রভু হেসে বলেন, যারা আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর ইহাই ধ্যান করে তাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না যাহা হউক, পরদিন প্রভু বৃন্দাবনের দিকে ছুটলেন, প্রয়োগে এসে জাহ্নবীকে যমুনা মনে করলেন। যমুনা ভেবে প্রভু নদীতে ঝাঁপ দিলেন, শীতকাল বলভদ্র ভয় পেয়ে ঝাঁপ দিয়ে প্রভুকে উঠালেন প্রভু প্রয়াগে তিন দিন থাকেন, লক্ষ লক্ষ লোক আসতে লাগল ও প্রভুর প্রেমে বিগলিত হল। প্রয়াগ থেকে দ্রুত বেগে চলতে চলতে, প্রভু শুনলেন মথুরায় এসেছেন, এমনকি হঠাৎ দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন, উঠে হুঙ্কার করে বিশ্রাম ঘাটে অবগাহনান্তে নৃত্য আরম্ভ করলেন। পভুর হুঙ্কারে চারিদিক কম্পিত হতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে লোক সমাগম হতে লাগল লোকেরা কৌতুক দেখতে এসে প্রভুর দর্শনে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য কোলাহল করতে লাগল। উহাদের মধ্যে একজনের নৃত্য ভঙ্গি দেখে প্রভু তার হাত ধরাধরি করে নৃত্য আরম্ভ করলেন তখন মধ্যাহ্ন, লোকটি প্রভুকে আপন গৃহে নিয়ে এলেন ইনি ব্রাহ্মন কৃষ্ণদাশ নাম। প্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করে বৃন্দাবন দর্শনে চললেন, প্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ননা করে ত্রিজগতে কেহ নেই, এমত স্থলে, যে রূপ প্রেম তরঙ্গ হত সম্ভব তাহাই বৃন্দাবনে হতে লাগল। বৃন্দাবনে "হরি বোল" ধ্বনি নেই সেথায় "কৃষ্ণবোল" তাই প্রভু বৃন্দাবনের বুলি "কৃষ্ণবোল" শ্রীবৃন্দাবনের যিনি নাগর তাঁর নাম কানাইলাল, কৃষ্ণ, নটবর শুনলে আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়। তিনি তথায় নিধুবন, ভান্ডারীবন, মধুবন, তালবন বেহুলাবন প্রভৃতি বিচরন করেন, তিনি বসে যমুনা পুলিনে দ্রাপড়ে কৃত অবিকল কার্যাদি বেনুগণ ময়ুর পুচ্ছ পরে সর্বত্র বিচরণ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব বিশ্বাস করতে বলেননি পরন্তু অন্যদেরকে জাগিয়েদিয়েছেন (৫৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সংসারে অহংবুদ্ধি বর্জন করে বাস করা যায়

কারন কাঁচা আমির লেশ মাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না, অবাক হয়ে সবাই ভাবেন।

এই অবতারপুরুষকে হাজরার মতো দুষ্ট প্রকৃতির লোক পায়শঃ সমালোচনা করায়

ফলতঃ শ্রীঠাকুরের নিজের ধারনা সম্বন্ধে সংশয় আসত।

যা তিনি নিরসন করছেন জগন্মাতার শরন নিয়ে শ্রীম এ প্রসঙ্গে ঠাকুরের একটি বিবরণ লিখেন

হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য এত ভাবো।

এনিয়ে শ্রীঠাকুর মহাভাবনা হল বলে মাকে জিজ্ঞাসা করেন "নরেন্দ্র আর অন্য ছোকরাদের

জন্য এত ভাবি কেন"? মা বলেন ঈশ্বর চিন্া ছেড়ে ছোকরাদের চিন্া কেন?

একবার দেখালো মা-তুই-ই মানুষ হয়েছিস শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ এরূপ দর্শন

করে সমাধি একটু ভাঙ্গলে, হাজরার উপর রাগ করতে লাগলেন শ্রীঠাকুর।

শ্রীঠাকুর বলেন, শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল আবার ভাবলেন সে বেচারীরই দোষ

কি? সে জানবে কেমন করে, নরেন্দ্রও তো ঠাকুরের দর্শনাদি সন্দেহ করত।

শ্রীঠাকুরের ঈশ্বরীয় দর্শনাদি কখন কখন উচ্চকণ্ঠে সমালোচনাও করেছিলেন, ঠাকুর বলেন

আধ্যাত্মিক ভাবস্থ অবস্থায় শ্রীঠাকুর নরেনের সংশয়ে মজাই পেতেন।

শ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে জগন্মাতার স্মরন নিলে মা উত্তরে বলতেন, তুই নরেনের

কথা শুনিস কেন? দেখনা অবিলম্বে নরেন্দ্র সব মানবে।

শ্রীঠাকুর একবার বলছিলেন মায়ের উপর ভার দিয়েছি মা হাত ধরে আছেন, বেচালে পা পড়তে দেন

না, ঠাকুর অন্যদেরকে বিশ্বাস করতে বলেননি, পরন্তু অন্যদের বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শান্ত নিদর্শন সর্বক্ষনই কোন না কোন ভাবে ঈশ্বর চিন্তা (৬০)

শ্রী অনিল মোহন কর

ডেজ ইন অ্যান ইন্ডিয়ান মনাসটারী গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা বলছেন, ঠাকুর তাঁর তরুন শিষ্যদের সঙ্গে খেলা করতেন, যেন তারা নেহাৎ ছেলে মানুষ।

আসলে তিনি ছিলেন খুবই রঙ্গপ্রিয় মানুষ একদিন পঞ্চবটীর সামনে এক দর্শনার্থী ঠাকুর এই ভক্ত ছেলেদের সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলছে দেখেন, কখনও অন্যের কথা নকল করে ওদের হাসাতেন।

আবার পর মুহুর্তেই তিনি খুব গম্ভীর ওদের ঘুম থেকে উঠায়ে দিতেন, শেষ রাতে তারপর তাদের ধ্যান করতে বসায়ে দিতেন নিজের মাদুরের উপর।

আবার সন্ধ্যায় পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে পাঠাতেন পঞ্চবটীতে, গম্ভীর বা রঙ্গরত যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন, আনন্দের একটি বাতাবরন সর্বদা, শ্রীঠাকুরকে ঘিরে রাখত।

তিনি প্রায়ই বলতেন - যে ধর্মে মুখ গোমড়া করে রাখে সে ধর্ম তার কাছে নেই শ্রীঠাকুরের কিছু রসিকতার সঙ্গে দেখা যায়, একটি গম্ভীর ভাবযুক্ত থাকে।

মানুষের মনের ভিতর যে ক্রিয়াচলে যে সব দুর্বলতা বাসা বাধে সে সব প্রত্যক্ষ করার আশ্চর্য অন্দৃষ্টি ছিল ঠাকুরের, তাঁর রসিকতা সেই অন্দৃষ্টি সঞ্চিত।

সেই রঙ্গ কৌতুকের সঙ্গে কো না কোন ভাবে সংযুক্ত ঈশ্বর, কারন ঠাকুরের ময়ূরের গল্পটী যে ময়ূরটিকে বিকাল চারটার সময় আফিম খাওয়ার পর, রোজই চারটায় এসে যেত।

শ্রীঠাকুরের পুতসঙ্গ লাভ সম্পর্কে একটি রূপক আছে, একবার এ বস্তুর আস্বাদ যে লাভ করে তাকে বার বার ফিরে আসতেই হবে, শ্রীঠাকুরের শান্ত নিদর্শন, সর্বক্ষনই ঈশ্বর চিন্তা।

মহাপ্রভুর সহিত রাজ চাকুরী ছেড়ে রুপ ও সনাতনের মহামিলন বর্ননা (৬১)

শ্রী অনিল মোহন কর

মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে পৌঁছার পর জনরব উঠল, শ্রীকৃষ্ণ উদয় হয়েছেন এবং রজনীতে
যমুনায় কালীয় দমন করে থাবেন, এ অলৌকিক ঘটনা রটেগেল।

তাই লক্ষ লক্ষ লোক রজনীতে যমুনা তীরে দাঁড়ায়ে থাকে, কেহ কিছু দেখে আর কে কিছুই
দেখে না, শেষে প্রকাশ হল জালিকগন মৎস্য ধরার জন্য লোক নৌকায় বিচরন করে।

মহাপ্রভু ছদ্মবেশে আছেন বলে সকলে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই জালিকের কার্য্য কৃষ্ণেরই
কায্য বলে সাধারণ জনগন নির্ধারিত করলেন, আর প্রভু দিবানিশি নৃত্য করে চলছেন।

প্রভু দিব্যোন্মাদে দিবানিশি বিরচন করছেন তাই তাঁকে বৃন্দাবন হতে বের করতে না
পারলে রক্ষা নেই, ভক্তগণ একত্র হয়ে যুক্তি করে করজোড়ে প্রভুকে নিবেদন করতে বাধ্য হন।

প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হলে হাঁ সূচক জবাব পেয়ে পরদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করে দেশাভিমুখে যাত্রা করবেন
একদিন পথে কোন গোপ বালক বেনু বাজালে প্রভু বানবিদ্ধ হরিনের ন্যায় ঐ স্থানে পড়লেন।

মুচ্ছিত অবস্থায় প্রভু আছেন বলে তাঁকে ঘিরে ভক্তগণ সর্ন্পন করছেন , এমন সময়
এক পাঠান রাজার ছেলে বিজলী খাঁ যিনি ধার্মিক সঙ্গে সৈন্য সকলেই অশ্বারোহী।

প্রভুর রূপ ও তেজ দেখে যুবরাজ ভাবল সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে ধন রত্ন থাকায় লোকগুলি
সন্ন্যাসীকে ধূতুরা খাওয়ায়ে অচেতন করে সব ধন লঠে নেবার জন্য প্রচেষ্টা হচ্ছে।

দৈবক্রমে প্রভু চেতন হয়ে হুঙ্কার দিয়ে হরি ধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করলে পাঠানগণ
সহ রাজকুমার ও তাঁর গুরু সকলে প্রভুর চরনে লুটায়ে পড়েন।

কানাইয়ের নাট্যশালা রামকেশী গ্রামে গৌড়ের নিকট দবির খাস ও সাকর
উপাধাধারী দুই ভাই গৌড় রাজশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন, তারা দক্ষিনের ব্রাহ্মন।

রাজার কায্য করেন বলে জাতি নষ্ট অর্দ্ধেক মুসলমান, প্রচুর অর্থ বিতরন করেন বলে
ব্রাহ্মন পন্ডিতগন তাঁদের চলতে আপত্তি নেই, দুভাই-ই এক প্রকার বৈষ্ণব।

মহাপ্রভু অবতীর্ণ হবার পরই পূর্ণ বিশ্বাস তাই গোপনে মহাপ্রভুর নিটক তাঁরা পত্র লিখেন
প্রভু প্রতিউত্তর না দিয়ে স্বয়ং রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হয়ে উভয়েকে সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত করান।

উভয়ে রাজকর্মে নিয়োজিত ছিলেন, তবে রাজ সভায় গমন করেন না, রূপ দরবেশ হয়েছে
তাই রাজা তাঁকে ক্ষমা করে সনাতনকে কারাগারে বন্ধী করে রাজা উরিষ্যা আক্রমনে চললেন।

রূপও সনাতনের সন্তানাদি নেই, কনিষ্ট অনুপমের এক ছেলে আছে নাম শ্রীজীব
তাঁকে যৎকিঞ্চিত ঐশ্বয্য দিয়ে গদিতে বসায়ে সনাতনের জন্য দশ সহস্র রেখে বাকী অর্থ বিলায়ে বৃন্দাবনে চলে যান।

দুভাই ছেড়া কাঁথা ও কৌপীন অবলম্বন করে সঙ্গে কপর্দকহীন অবস্থায় কেউ কিছু দিনে খেয়ে
দীন হীন ভাবে কাঁপতে কাঁপতে প্রয়াগে প্রেমে উন্মত্ত অবস্থায় দেখে চিনে প্রভুর নিকটস্থ হলেন।

প্রভুকে সনাতন বন্ধী আছেন জানালে বুকে আবেশ ভরে দুভাইকে আলিঙ্গনে জড়ায়ে ধরেন
সর্বজ্ঞ প্রভু তখন সনাতন বন্ধী মুক্ত হয়ে এখানে আসছে বলে রূপকে প্রভুর নিকট কিছু দিন রাখেন।

রুদ্রাক্ষ ধারনের উপকারিতা ও ধারনের পদ্ধতি বর্ণনা (৬২)

শ্রী অনিল মোহন কর

রুদ্রাক্ষ এক প্রকার ফলের বীজ, পুরানে আছে শিবের চোখের জল থেকে সৃষ্টি রুদ্রাক্ষ

আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক বিজ্ঞানে বলা হয়েছে রুদ্রাক্ষের শক্তি সীমাহীন।

জ্যোতিষ, আর্য়ুবেদ, মন্ত্র শাস্ত্র ও ভৌতিক বিজ্ঞানেও রুদ্রাক্ষের বহু গুন কীর্ত্তন আছে

রুদ্রাক্ষ এক হতে একুশ মুখী পর্যন্ত আছে, তবে পনের হতে একুশ মুখী পাওয়া দষ্কও,

এক মুখী রুদ্রাক্ষ দামী, ইহা ধারনে জ্ঞানবুদ্ধি ও সর্বসিদ্ধি, দেবীকৃপা ও ধনধান্য বৈভব প্রাপ্তি হয়

দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ ধারনে মনের চঞ্চলতা দূর, বশীকরণ মুক্ত, মৃগী মুর্চ্ছা রোগ ভাল হয়।

তিন মুখী কায্যসিদ্ধি, বিদ্যালাভ, সাংসারিক জীবনে সুখশান্প্রিদ, চারমুখীকে ব্রহ্মরূপ

বলা হয়, একে পূজা, স্পর্শ, ধারন সকলই কল্যানকর ও পাপ নাশ সদবৃত্তি লাভ হয়।

পঞ্চমুখী সহজে পাওয়া যায়, এর প্রভাবে মোক্ষ লাভ শান্লিাভ তবে কমপক্ষে তিনটি ধারন

প্রয়োজন, ষষ্ঠ মুখী শাস্ত্র একে কার্ত্তিকেয়ের অংশ বলে ধারনে পাপ ক্ষয় বুদ্ধিজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

সাত মুখী পরম সিদ্ধিদায়ক, রোগনাশক ও সুখ দায়ক আট মুখী এটি ভৈরবরূপী পাপ নাশক

দীর্ঘায়ুদায়ক ও শিবলোক পথ প্রদর্শক, নয় মুখী এটি দেবী দূর্গার নয়টি রূপ।

নয় মুখীর আরও গুন যাহা সুখ সৌভাগ্যদাতা ও দিব্য গুনযুক্ত পরম কল্যান-দায়ক

দশ মুখী ভগবান নারায়নের কৃপায় উৎপন্ন, রোগ শোক নাশক বাধা বিঘ্ন অপসারক।

এগার মুখী এতে সন্মোহনী ও শ্রীবৃদ্ধির প্রভাব বার মুখী ধারনে তেজস্বিতা ও শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি হয়

তের মুখী সুখ, সৌভাগ্যদাতা অভিষ্ট সিদ্ধিকারী, চৌদ্দ মুখী শিবের প্রিয়, পাপ নাশক সাত্ত্বিকতা দায়ক।

রুদ্রাক্ষের মালা ধারনের পূর্বে অবশ্যই উহা শোধন করে দশবার শিব-জ্ঞায়ত্রী জপ করে

"ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে ১০৮ বার হোম করে যথাবিহীত পূজা করতঃ উত্তর মুখী হয়ে ধারণ করা উচিত।

সাধকগণের সাধনার আসন সম্বন্ধে বর্ণনা (৬৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

তন্ত্র সাধনায় আসন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, বিভিন্ন আসনে বসে

মনীষীগণ সাধনার জন্য বিভিন্ন আসন ব্যবহার করে থাকেন যাহা নিম্নে বর্ননা করা হল।

কাষ্ঠাসন- কাঠের তৈরী পিঁড়ি, চৌকি ইত্যাদিতে সাধনা করলে সাধকের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে

ভূমি আসনে শুধুমাত্র মাটিতে বসে সাধনায় সাধকের হানিপদ ও মানবিক কষ্ট উৎপন্ন হয়।

পাতার আসনে সাধনা করলে ভ্রম উদ্বেগ ও বিক্ষিপ্ততায় আক্রান্ হয়, তৃণাসনে সাধনা

করলে সাধকের অর্থ ও কীর্ত্তিনাশ হয়, প্রস্রাসনে রোগ ও শারীরিক পীড়াগ্রস্থ হয়।

বাঁশ চেয়ার ও বস্ত্রে বসে সাধনা করলে সাধক দরিদ্র রোগ ও শারীরিক পীড়া হয়

মৃগ চর্ম-আসন সাধনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, সাধকের জ্ঞান বৃদ্ধি, সিদ্ধিলাভ তবে কৃষ্ণ-মৃগ চর্ম উৎকৃষ্ট।

ব্যাঘ্রচর্ম আসন অর্থদায়ক ও মোক্ষদায়কতা বেত্রাসনে সাধনা শান্দিায়ক হয়ে থাকে

কম্বলাসন- ইহা দেহমনের ক্লেশ দূর করে ও শান্ি ও সিদ্ধিদায়ক তবে চিত্র বিচিত্রাসন সর্বশ্রেষ্ঠ।

যুগে যুগে সনাতনী সাধকগণ মানব কল্যানের জন্য অনেক তথ্য বর্ণনা

করেছেন যাহা সত্যই কুশাসনই সাধনার পথে শ্রেষ্ঠতম আসন।

তন্ত্র সাধকগণ অন্য মতকে অশ্রদ্ধা করেন না (৬৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

তন্ত্র সাধনায় মানবকূল যেভাবে দেবদেবীকে ধারনা করার অবকাশ পেয়ে থাকেন

অন্য সাধনায় এ সুযোগটি সাধারনতঃ দেখা যায় না।

তন্ত্র সাধনায় এক দেবী বা দেবতাকে সাধনা করতে অন্য দেবদেবীকেও ধারনা

করা বা ধ্যান, চিন্া করা নিষিদ্ধ নহে বলে পথটি শ্রেষ্ঠ।

কারণ এ মতে যে কোন পথেই চলুক না কেন শ্রীগুরুর নিষেধাজ্ঞা নেই

কারন শ্রীগুরু জ্ঞাত যে, দেবতা পরশ্রীকাতর নয় যে একজনকে ভজলে অন্যজন দুঃখ পাবেন।

নিজস্ব ইষ্টদেব প্রাপ্ত হয়ে ভক্ত একদেবের ভজনকারী হয়ে অন্য দেবদেবীর শ্রদ্ধা বা ভজন করা যাবে না

এরূপ কোথাও দেখা যায় না, তাহাই লেখক মনে করে থাকেন।

বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রয়োজনে দেব দেবীর সাহায্য কামনা করে বর প্রাপ্ত হয়ে

বরপ্রাপ্তকারী তার আপন কায্য সাধনের জন্য অগ্রসর হয়ে জয়লাভ করেন।

যেমন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কুন্দিেবী ও তাঁর পুত্রগণ কাত্যায়নী মাকে ভজন করে বর প্রাপ্ত

হয়ে যুদ্ধ জয় লাভ করেন, এরূপ বহুক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে সন্দেহ নেই।

সে জন্যই হয়ত তন্ত্রধারীগণ অন্য মতের ভক্তগণকে অশ্রদ্ধায় ভেসে যান না

বরং অন্য মতকে শ্রদ্ধাও ভক্তি তাঁদের স্বাভাবিক ব্যাপার।

সাধারনতঃ দেখা যায় তন্ত্রপন্থীগণ ধর্মগ্রন্থাদি ঘাটাঘাটি করতে অভ্যস্ত্ম

কিন্তু অন্য মতের ভক্তগণকে এতটা ধর্ম গ্রন্থাদি ঘাটাঘাটিতে অভ্যস্ত্ম নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্র সাধনায় শ্রীমা কালিকাদেবীর অবতার হয়েও শ্রীরাম ও কৃষ্ণ

সকলকে সমদৃষ্টিতে শ্রদ্ধাভক্তি করেছেন বলেই তাঁর অনুসারীরাও **"যত মত তত পথ"** পথে ধেয়ে চলেন।

নরেন্দ্রকে নির্বিকল্প সমাধির প্রলোভন থেকে শ্রীঠাকুর মানব মুক্তির অগ্নি-যজ্ঞে নিক্ষেপ (৬৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম করুনায় অনেকগুলি দৃষ্টান্ স্বামী শিবানন্দ দিয়েছিলেন যাহা শ্রীরাকৃষ্ণের জীবনী

পাঠকগণের নিকট পরিচিত, তিনি কিভাবে নরনারী পন্ডিত-মুর্খের প্রতি প্রেম সমভাবে বর্ষন করতেন।

তাদের দুঃখ উপশমের অবিরাম ঐকান্কি উৎকণ্ঠা বোধ ও ব্যাকুল থাকতেন

যাতে তারা ঈশ্বরানুভূতি পেয়ে চির শান্ি লাভ করে এ কালের পৃথিবীতে মানবের কল্যানে নিয়োজিত।

নরেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধির প্রলোভন থেকে আকর্ষন করে মানব মুক্তির

অগ্নিযজ্ঞে নিক্ষেপ করেছিলেন ও নরেনকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা তাঁর দিব্যবানীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার, তাই স্বামিজীর

জীবনও কায্যাবলীর মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের করুনার প্রকতি বুঝবার প্রয়োজন।

স্বামী শিবানন্দজী-স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত সেবা ধর্মের আধ্যাত্ম্য প্রকৃতি উৎকৃষ্ট ভাব বিশ্লেষণ করেন,

কেউ কেউ মানব সেবার উদ্দেশ্যে, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মানবের মধ্যে উপলব্ধির প্রার্থক্য আছে বলেন।

বস্তুতঃ পক্ষে ঐ অবস্থা একই মনের দুই অবস্থার রূপ মানবের অন্র্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করার

পরেই কেবল তার দুঃখের গভীরতা অনুভব করতে পারা যায়।

কারণ তখনই কেবল চেতনার ধরা পড়বে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ মানুষ দিব্য

পূর্নতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে কতখানি শূন্য জীবন যাপন করছে।

নিজের ও অন্যের আত্মার সমত্ব বোধ না এলে যথার্থ অনুভূতি সহানুভূতি প্রেম ও সেবা সম্ভব নয়

তাই ঠাকুর চেয়েছেন মানব সেবা গ্রহনের পূর্বে তাঁর শিষ্যগণ আত্মোপলব্ধি করুন।

শ্রীকৃষ্ণ লীলা শেষে সবার অগোচরে ব্যাধের হাতে দেহটী তুলে দেন (৬৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীরামচন্দ্র নিজের জীবনে ধর্ম আচরণ করে আদর্শ স্থাপন করেছেন, কিন্তু কেউকে সে আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দেননি বা শিক্ষাও দিতে যাননি অথচ অবতার হিসারে পরিচিত।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আগাগোড়াই জীবন-যোগের শিক্ষাদাতা গুরু-প্রাণ কান্ডারে পথ প্রদর্শন সারথি শুধু অর্জুনকে গীতার উপদেশটুকুর মধ্যেই তাঁর যোগ শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়।

সমগ মহাভারতের নানা ঘটনার সঙ্গাতে যেখানেই সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে সেখানেই তিনি পান্ডবদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কৌরবদের কাছেও দৌত্য করতে ছুটে গিয়েছেন।

শুভ বুদ্ধির উদয় করাবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন, এ গুরুরূপের পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আরও দুটিরূপ প্রকাশ পেয়েছে, যেটি তাঁর সখারূপ এবং বল্লভরূপ।

পান্ডবদের বিশেষ করে অর্জ্জুনের রুক্মিনী আবার গোপীদের কাছে গোপীজন বল্লভ বৈষ্ণব দর্শনে সমস্ রসের আধার রূপে তিনি ষোল কলায় কৃষ্ণ চন্দ্র “কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং”।

এভাবে তাঁর মধ্যে ঐশ্বয্য ও মানুষের পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে, বৃন্দাবন, মথুরা দ্বারকায় তিনি অধিষ্টিত থেকে এক ভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তবে তিনি যুদ্ধের মধ্যেও যোগের উপদেশ করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর প্রধান সেনাপতি ভীষ্মের মহাপ্রয়ানের সময় তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ায়ে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের উপদেশ নিতে পান্ডবদের উৎসাহিত করে কর্ণকে পান্ডবদের দলে আনার প্রয়াস করেন।

এ লক্ষকে সামনে রেখে ধর্ম সংস্থাপন করেন অনৈতিক পথ অবলম্বনে তাঁর দ্বিধা ছিল না তিনি সর্বদা নির্লিপ্ত অসংস্পৃষ্ট ভাল বা মন্দ কোন কিছুই তাঁকে বাধতে পারে নাই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে নিজ যদুবংশের ধ্বংসেও কোন বিলাপ বা হুতাশ শোনা যায় নাই নিঃশব্দে কুরুক্ষেত্র থেকে বিদায় নেন, এমনকি তাঁর লীলা ক্ষেত্র বৃন্দাবন থেকেও চলে আসেন।

শেষে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়ে অগোচরে ব্যাধের হাতে নিজের দেহটী তুলে দেন

যিনি বিশ্বের রক্ষা বা পালকের জন্য ব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সাত্ত্বত বংশে উদিত হয়ে প্রকট হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণরূপে।

উৎকোচের বিনিময়ে সনাতনের কারাগার হতে মুক্তি (৬৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

শচীমাতার একটি গীতের কিয়দাংশ উদ্ধৃত হলঃ-

তোমরা কেউ দেখেছ যেতে,

আমার সোনার বরণ গৌর হরি জনেক সন্ন্যাসী যেতে।

তাহার ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢলে যায় যেন পাগলের প্রায়,

মুখে হরে কৃষ্ণ বলে, দন্ড করোয়া হাতে।।

শচীমাতা এই গীত গাহিয়া নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পরে নদীয়া নগরে, তাঁর পুত্রকে তল্লাস করছেন, গৌর হতে বৃন্দাবন চার মাসের পথ, গৌর হতে বৃন্দাবন যাবার বহু পথ।

তবে সনাতনও প্রভুকে এ বলেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন কারাগার থেকে সনাতনের ধর্ম ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত সনাতনকে কারারক্ষককে উৎকোচ দিয়ে বের করে রজনীতে পার করে দিলেন।

সনাতন এক মনে বৃন্দাবনের পথে কেউকে কোন কিছু মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাস না করে একমনে বলছেন সনাতন বারানসীতে পৌঁছে জানেন যে , চন্দ্র শেখরবাড়ীতে লক্ষ লক্ষ লোকের হরি ধ্বনি হচ্ছে।

ওদিকে সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু চন্দ্র শেখরকে বলেন তাঁর দ্বারে যে বৈষ্ণব আছে তাকে ডেকে আন একথা শুনে চন্দ্র শেখর এসে কোন বৈষ্ণব না পেয়ে পভুকে জ্ঞাত করলে তথায় বৈষ্ণব রয়েছে বলেন।

চন্দ্র শেখর পুনঃ এসে দেখেন এক দরবেশ কম্বল গায়ে দ্বারে বসা, দরবেশ চন্দ্রশেখরকে বলেন, হ্যাঁগা, মশাই প্রভুকি আমায় ডাকছেন ? আমাকে ডাকবেন কেন ? হয়ত অন্য কেই হবে।

চন্দ্রশেখর বলেন,প্রভু আপনাকেই ডাকছেন, তবু সনাতনের সন্দেহ গেল না, তিনি কি নরাধমকে ডাকবেন ? এই সমুদয় কথা শুনে চন্দশেখর বলেন, প্রভু আপনাকেই ডাকছেন, আপনি আসুন।

তখন সনাতন ভক্তমাল গ্রন্থের কথা স্মরণ করে বলেন ঃ-

দুই গাছাতৃন করে, একগোছা দন্তে ধরে পড়িল গৌরাঙ্গ, রাঙ্গা পায়।

দু'নয়নে শতধারা, রাজ দন্ড পায়া, অপরাধি আপনা মানয়।।

তোমার চরণ নাহি ভজি মোর গতি এহি, সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।

কদর্য বিষয় ভোগ, কামাদি, ষড়ঙ্গ রোগ, তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি ।। ইত্যাদি।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবনের পথে সিদ্ধ বটেরশ্বরে পৌঁছে সত্যবাঈ ও লক্ষ্মীবাঈ, ও তীর্থরামকে উদ্ধার (৬৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

বৃন্দাবনের পথে প্রভু সিদ্ধ বটেশ্বর গিয়ে সেখানকার শিবকে প্রনাম করে রাতে পৌঁছেন

রাতে কোন আহার জুঠে নাই প্রাতে যা জুঠল সেবা করে বসে যেন কারো জন্যে অপেক্ষা।

প্রভু এখানে একটি লীলা করবেন মনে ভেবে চুপে চুপে এসে সামান্য অবস্থায় রইলেন

ঠিক যেন, সামান্য সন্ন্যাসী, সেথায় তীর্থরাম নামে এক সওদাগর অভক্ত ও ধনবান লোক আসেন।

সন্ন্যাসীকে দেখে একটি আমোদ করার ইচ্ছা হলে নিজে যৌবন মদে ও ধনমদে আবার চরিত্রও অতি মন্দ

বলে, তাঁর ইচ্ছা হল, নবীন সন্ন্যাসীর ধর্ম নষ্ট করার জন্য দুজন বেশ্যা সত্যবাঈ ও লক্ষ্মীবাঈকে আনেন।

বেশ্যাদিগের কি কি করতে হবে তীর্থরাম তাদেরকে শেখায়ে দিলে সেরূপ রঙ্গ করতে শুরু করল সন্ন্যাসীর

সনে, এমন কি সত্যবাঈ নিজ অঙ্গ কাপড় ফেলে দিয়ে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে শুরু করল।

প্রভু তখন তার দিকে তাকালে সত্যবাঈ বিচলিত হয়ে প্রভুর চক্ষু দেখে কারন্যরস ছোয়াইল

তিনি অতি পবিত্র বিকার নেই, যেন উনি মনুষ্য নহেন দেবতা প্রভু মা তুমি কি চাও ?

খুব আস্তে আস্তে মা ডাকলে, বেশ্যার হৃদয় হতে রসরঙ্গ দূরে গেল, কাঁপতে শুরু করলে লক্ষ ও ভয়

পেয়ে উভয়ে প্রভুর চরণে পড়ল, তখন তটস্থ হয়ে তোমরা আমার মা।

কেন আমার চরণে পড়ে আমাকে অপরাধী করছ? কথা গুলি বলতেই ধরনীতে লুটায়ে পড়েন

প্রভু, প্রভুর কান্ড সবই তীর্থরাম দেখছেন মনে মনে প্রভু তো ভন্ড নয় বরং ক্ষমতাশালী।

তীর্থরাম প্রভুর চরণে পড়ে দলিত হতে লাগলেন প্রভু তীর্থরামের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সত্যবাঈকে

বাহুতে ধরে কৃষ্ণ বল, মুকুন্দ ও মুরারিকে ডাকো, তখন তিন জনই মৃতপ্রায় অবস্থায় আছেন।

প্রভু তখন তীর্থরামকে আলিঙ্গল করলে, আমি অপবিত্র, অস্পৃশ্য, আমায় স্পর্শ করবেন না, উত্তরে প্রভু বলেন

“পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে” প্রভুর কৃপায় সকল ধন সম্পদ ও ভায্যা ছেড়ে পথের ভিখারী হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি- যারা ঈশ্বর কোটি ইচ্ছা করলে মুক্ত হতে পারে আর জীব কোটিরা পারেনা (৬৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

বুদ্ধদেবের দুহাজার চারশত বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি ছিল বেদপরম্পরা ভিত্তিক, কিন্তু অসীমের সমুদ্রে তিনি একজন সাহসী ও স্বাধীন যাত্রী। রহস্য বিদ্যা ও দর্শণের সূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ধামাননি, তিনি বলেছিলেন যে, বাগানে কত গাছ, কত ডাল এসব হিসেবে কাজ কি? তুমি আমি খেতে এসেছ আম খাও। তাঁর উপদেশাবলী থেকে আমরা জীব ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কথা জানতে পারি বুদ্ধদেবের চিন্া ধারার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের তুলতা করলে স্বামিজীর উক্তি স্মরণ উচিত। স্বামিজাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সনাতন হিন্দুধর্ম এককেই সৎ ও বহুকে অসৎ বলেছেন আবার বুদ্ধদেব কি বহুকেই সৎ ও অহংকে অসৎ বলেন নাই। উত্তরে স্বামিজী হ্যাঁ বলেন আর, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও আমি উহাতে শুধু এটুকু যোগ করছি যে, বহু ও এক উভয়ে একই মনের দ্বারা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধি সেই একই সত্য। মৃত্যুর পরে অবস্থা সম্পর্কে শ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিজস্ব মত বলতেন না কখন বা বলতেন গীতায় আছে মৃত্যুর সময় যে যা চিন্া করে প্রাণত্যাগ করে তা-ই হবে। অর্থাৎ হরিণকে চিন্া করে দেহত্যাগ করে, ভরত, রাজার হরিণ জন্ম হয়েছিল অবশ্য তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে, তিনি জীবাত্মার অস্তিত্ব করতেন। তাছাড়া তিনি জীব কোটিকে ঈশ্বর কোটি থেকে পৃথক করেছেন, যারা জীব কোটি তারা সাধনা করে ঈশ্বর লাভ করতে পারে, তারা সমাধিস্থ হয়ে আর ফিরে আসে না। যারা ঈশ্বর কোটি তারা ইচ্ছা করলে নেমে আসতে পারে, ঈশ্বর কোটি ইচ্ছা করলেই মুক্ত হতে পারে, আর যারা জীবকোটি তারা মুক্ত হতে পারে না।

এ পৃথিবীতে বিধির বিধানে অনেক কিছু ঘটে (৭০)

শ্রী অনিল মোহন কর

কাশীধামে না গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে জায়গা কিনে মন্দির করে শ্রীকালী মাকে

প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার জন্য নিয়োগ করেন রানী রাসমনি রামকুমারকে।

জামতা মথর বাবু বিধির বিধানে নিয়োগ করেন পূজারীর ছোট ভাই গদাধর ভট্টাচার্য্যকে

শ্রীকালীমার নিত্য ফুলের মালা তৈরী করে সাজাতে গদাই ঠাকুরকে।

শ্রীকালীদেবী ফুলের মালায় সজ্জিত হয়ে তৈরী করেন গদাই ঠাকুর মনের মত করেন

বড় ভাই অসুস্থ হয়ে বাড়ী গেলে ছোট ভাই গদাই ঠাকুর প্রাপ্ত হলেন পূজারীর দায়িত্ব।

পরিপূর্ণভাবে পূজারীর দায়িত্ব পেয়ে গদাই পেলেন শ্রীকালীকার দর্শনাদি বহু

ত্যাগ তিতিক্ষার, বিনিময়ে যা আমরা দেখি, শুনি ও পড়ি পুঁথি পুস্ত্মকে।

বিধির বিধানে ন্যাংটা সাধু ও ভৈরবী মায়ের কৃপায় বহু রকম সাধনায় হলেন পরিচিত

এ যুগের শ্রীকালীকা দেবীর অবতার আরও কতকিছু পড়তে পাই আমরা সবে।

এ কীর্ত্তিকান্ডের কান্ডারীর নিল না কেউ খবরাদি শ্রীরামকৃষ্ণদেব চলে গেলেন

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কাশীপুর তাঁর চেলা চামুন্ডা নিয়ে, রইলেন বেশ কিছুকাল বেঁচে।

শেষে লীলা সংবরণ করলেন রেখে স্বামী বিবেকানন্দ সহ বহু ভক্ত সন্ত্মানকে

বহু কষ্ট সইতে হলো স্বামিজী সহ সকল ভক্ত সন্ত্মান, প্রয়োজন নেই উল্লেখের।

দেখি আমরা সবাই চক্ষু খুলে প্রান -ভরে বেলুড় মঠে রয়েছেন শ্রীঠাকুর

শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দজী ও অন্যান্য কর্ত্তা ব্যক্তিগণ নিয়ে।

সংসারে কীত্তিকারক যাঁরা তাঁরা সত্য হলো না কোন দিন ফেলনা

তাই বলে ইহাই কহে শাস্ত্রে সীতাকুন্ড রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমও হয়ে গেল তেমন বটে।

বিশ্বব্যাপী ছড়ায়ে পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণ রাজত্ব বেলুড় মঠ হল রাজধানী, ছড়ায়ে

পড়ছে দেশবিদেশে ইয়ত্বা নেই এ রাজত্বের, চালাচ্ছে অদৃশ্যে থেকে রাজা মন্ত্রীগণ দিয়ে।

মহাপ্রভুর দাক্ষিনাংশে ভ্রমন ও অন্ধের চক্ষু দান (৭১)

শ্রী অনিল মোহন কর

মহাপ্রভু যখন ভারতের দক্ষিনাংশে ভ্রমন করেন তখনকার সময়ে মুসলমানেরা ভারতে আসার পূর্বে দক্ষিনদেশ দেখলে বুঝা যেত ভারতবর্ষে কি অবস্থা বিদ্যমান ছিল।

মহাপ্রভু বিষ্ণুকাঞ্চি হতে ছয় ক্রোশ দূরে চারিহস্ত বিশিষ্ট গৌরিপট্ট শিব মন্দির তথা হতে নীচে পক্ষ তীর্থ ভদ্রানীর ধারে, ওখান থেকে পাঁচক্রোশ দূরে বাল তীর্থ।

এখানে বরাহদেবের মুর্ত্তি দর্শন করে প্রভু পলকিত ও দরদরিত ধারা হয়েও আকুল হলেন সেখান হতে অল্প দক্ষিণে সন্ধিতীর্থ তথায় নন্দী ও ভদ্রা দুই নদীর সঙ্গম স্থান।

এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক তেজস্বিনী শতবর্ষী এক সন্ন্যাসীনি চাঁইপল্লী তীর্থ নামক বিল্ব বৃক্ষ তলায় ধ্যানস্থ, তথায় শৃগালী ভৈরবী নামক বিগ্রহ তিনি পূজা করেন এ সব প্রভু দর্শন করেন।

ওখান হতে প্রভু নাগর নগর ঠাকুর রাম লক্ষ্মন দর্শন করেন ও তিন দিন নৃত্যগীত ও নাম বিতরণ করেন, ফলে বহুলোক অনেক দূর হতে আসতে লাগলে প্রভুর প্রতাপ দেখে এক ব্রাহ্মনের ঈর্ষা হল।

ঐ ব্রাহ্মন প্রভুকে ভন্ড বলে আখ্যা দিয়ে বহু গালমন্দ করতে করতে বলে নির্বোধ লোককে ভুলাচ্ছে এভাবে নানা মন্ব্য করতে থাকে, প্রভু যখন নদীয়ায় তখন প্রহারের ভয়ে সন্ন্যাসী হন, এখানেও নিস্তার নেই।

ব্রাহ্মনের কথায় প্রভু হাস্যকরে মুখামুখী হয়ে বলেন প্রভু দয়াময়, তুমি একবার হরিবোল পরে আমায় মেরে ফেল, ব্রাহ্মনকে প্রভু আরও উপদেশ দেওয়ায় প্রভুর চরণে পড়লে চৈতন্যদেব নগর ছাড়লেন।

এভাবে চলতে চলতে পভু পদ্মকোটি গিয়ে অষ্টভূজা দেবীকে দর্শন করেন ও হরিধ্বনি দিতে থাকেন, তখন বহু ভক্ত সমাগম হল, মন্দির প্রাঙ্গনে পুষ্প বৃষ্টি ও পদ্মগন্ধে ভরে গেল।

এমন সময় এক অন্ধ এসে প্রভুর চরনে পড়ে বলে কাল রাতে আমাকে ভগবতী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন, আজ তুমি এখানে আসবে, তাই আমি তোমার রূপটী দর্শন করে জীবন ধন্য করব।

প্রভু অনেক তত্ত্বকথা উপদেশ দিলেও অন্ধ বলে তোমার রূপটি আমায় একবার দেখতে দাও তখন প্রভু অন্ধের হাত ধরে গাঢ় আলিঙ্গন করলে তখনি নয়ন খুলে প্রভুকে দর্শন করে মৃতুর কোলে ঢলে পড়ে।

তন্ত্রে বীজমন্ত্র ও মন সাধনা (৭২)

শ্রী অনিল মোহন কর

কোন অভিপ্রেত দেবতা অর্থাৎ ইষ্টদেবতার নাম ও যা

আর তার জীবমন্ত্রও তাই ইষ্ট বা বীজমন্ত্রকে নাম বলে।

যা নামী বা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়

যেমন দক্ষিনা কালী, রক্ষা কালী ও জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বুঝায়।

কোন দেবতা বা দেবীর নির্দ্দিষ্ট একটি মাত্র বীজ থাকে

আবার একই বীজমন্ত্র অনেক দেবতাকেও বুঝায় বীজ কেন্দ্রীভূত শক্তি।

বীজমন্ত্র কামকলা মুন্ডলিনী, কুন্ডলিনী অব্যক্তা

কেন্দ্রীভূত বলেই শক্তি কুন্ডলিনী, তাছাড়া বৈদিক বীজমন্ত্র প্রনব।

প্রনব বা ওঁকার সকল উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে

ওঙ্কার বা প্রনবের ব্যাপ্তি বিশ্বচরাচরকে নিয়ে ওঁ ব্রহ্মা, বিষ্ণুও মহেশ্বরকে বুঝায়।

বীজের অপর নাম মাতৃকা বা বর্ণ কালীর গলায় মুন্ডমালা

মাতৃকা মন্ত্রেরই মালাবীজশক্তির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে বুঝায়।

নিরপক্ষ সত্তা ব্রহ্মাই জড় ও চৈতন্য-জীব ও ঈশ্বরের মিলন ভূমি

এই ভূমিই ব্রহ্মা, বীজাত্মক বিন্দু বা ব্রহ্মাকে মহাশক্তির আধারকে উৎস বলে।

এই কারনের নাম মহাকারণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন কারনের পর

মহাকারন এ মহা কারণ কিন্তু যথার্থভাবে কারন নয়।

কেন্দ্রগত সর্বাতীত বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হলে সাধকের মায়া

বা অবিদ্যার নাশ হয়, এখানে অবিদ্যা ও মায়া এককথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল

তবু ভেদ করে উঠে যায়, বীজ একক্ষরী, দ্যক্ষরী, ত্র্যঅক্ষরী, একাদশাক্ষরী ইত্যাদি।

তন্ত্র ও তত্ত্ব সম্পর্কে সাধক রামপ্রসাদ (৭৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে

আহার লোভে সদাই চলে

তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও

ছোবেনা তার গন্ধ পেলে।

কুন্ডলিনী কালীর কুলে যেতে আধার শক্তির জাগরণ চাই, সাধক রামপ্রদাস বলেছেন

শক্তির জাগরণের পথে বাধা প্রতিবন্ধক অনেক, ওগুলি কাটায়ে যেতে হবে সিদ্ধি লাভের জন্য।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য এই ছয়টি কুম্ভীর এই হিংস্র জন্তুগুলি আর কামাদি রিপুও হিংস্র

কামনা-বাসনার নাম আসক্তি এই আসক্তির নামই মায়া বা অবিদ্যা।

অবিদ্যা জ্ঞানকে আবৃত করে জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত করে রাখে মানুষকে শত্রু হিসেবে

কামক্রোধাদি বিষয়ের চরিতার্থ হয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা।

ইন্দ্রিয়গগুলি প্রার্থিব জ্ঞানের সহায়ক ও দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা যায় প্রানায়াম প্রক্রিয়ায়

জ্ঞান বিচারে, কামাদি বিষয়ে আসক্ত হয়েই মানুষ সংসারে ভোগের জন্য পাগল হয়।

এই পাগলামি অনিষ্টকর আত্মদর্শনের পথে এরা বাঁধা সৃষ্টি করে, মানুষ এই রহস্য জানে

তবুও সংসারের আকর্ষণ জেনেও কামাদি বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে।

বিবেক অর্থে কোনটি সৎ কোনটি অসৎ কোনটি কল্যানকর বা অকল্যানকর এই

বিচারের কর্মও অবস্থা, তাই রামপ্রসাদ বলেছেন বিবেক হলুদ গায়ে মেখে যাও।

ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে বিবেক বিচার ও সত্য জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ও জীবনের

যথার্থ লক্ষ্য কী তার দিকদর্শন করে ও আধ্যাত্ম জীবনে মুক্তির পথে বিচার বিহীন মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য বিহীন অন্ধ হয়।

অভ্যাস বিবেক বৈরাগ্য থাকলে কাম ক্রোধাদি রিপু বা শত্রু সংযত ও বশীভূত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা

তন্ত্রতত্ত্ব সাধনা সফল হয়, মুক্তির আকাঙ্খা ও আকুলতায় মানুষ অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

ভারতে বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায় রয়েছে (৭৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

মন্ত্রাদিপতি দেবতার সঙ্গে মনের ঐক্য সাধন করে জপ করলে মন্ত্র সাধকের অজ্ঞান মুক্ত করে

জ্ঞাত যে, বামন পুরানেও মস্য পুরানে তন্ত্র দৃষ্টিতে অগ্নিষোমের দেবী কৌষিকী ও অগ্নি দেবী কালিকা।

ঋগ্বেদে অগ্নিষোমের উল্লেখ রয়েছে পুরানে দেবী কৌষিকা প্রসন্ন মূর্ত্তি ও দেবী কালীকার উগ্র মূর্ত্তি

তবে দেবী কালিকা সৃষ্টিকারিনী আবার প্রলয়ঙ্করী, শ্রীচন্ডিতে দেবী চামুন্ডের উল্লেখ আছে।

শ্রীদূর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে দেবী চামুন্ডার আবির্ভাব, শ্রীতত্ত্ব চিন্তামনিতে

পরমহংস বারাহী দেবীর পর দেবী চামুন্ডার পরে মহালক্ষীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন।

বেদে সপ্তমাতৃকার উল্লেখ রয়েছে, ঐ সপ্তমাতৃকার নাম ব্রহ্মানী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রানী

বারাহী, নারসিংহী ও চামুন্ডা, তন্ত্রে ঐ সপ্তমাতৃকাই শ্রীচন্ডি, দূর্গা ও কালীর রূপান্তর ও নামান্তর।

ঐ সকল তান্ত্রিকী দেবী অগ্নিরূপা শিবের সম্পর্কিত তাছাড়া ঐ মাতৃকাগণ দেবী কাত্যায়নী যিনি

শ্রীদূর্গার আদি ও প্রতিরূপ- তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ঐ রূপের আলোকেই বৈদিক দেবী অদিতি, উষা, সরস্বতী, তান্ত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল।

বারাচার বা বামাচার প্রভৃতি সাধনা আসাম কামাক্ষাদেবীর বারাচার মতে পূজা পদ্ধতি থেকে

সৃষ্টি হয় বলে ধারনা যদিও মতভেদ আছে, কামাক্ষাদেবীর বীরাচার মতে পূজার প্রচলন ছিল।

ভারতে তন্ত্র শাস্ত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি শাস্ত্রগুলির নির্দ্দেশিত সাধন প্রনালীও

ভিন্ন ভিন্ন, তাছাড়া আম্বায় ভেদেও আচার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গিও পার্থক্য আছে।

স্বামিজী মহারাজের শিকাগো বর্ক্তৃতায় ভারত সত্যকে উৎঘাটিত (৭৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজীর ভারত পরিক্রমার শেষ ভাগে তাঁকে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়

যা তাঁর আধ্যাত্মিক কর্মধারাকে অত্যন্ত অভাবনীয় ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৮৯৩ খ্রীর শিকাগোতে ধর্ম সম্মেলন হবার কথা কিছুদিন থেকেই তাঁর মনে চিন্তা আলোড়িত হচ্ছিল

তা হলো সনাতন ধর্মের আদর্শকে এই সম্মেলনে উপস্থাপিত করতে হবে।

পরিক্রমায় অভিজ্ঞতার উৎসাহিত হয়ে তিনি ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁহার আধ্যাত্মিক কর্ম সাফল্যকে

পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য হিন্দ্ ধর্মমে কি ব্যাখ্যা হয়েছে জানা দরকার।

এ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন অথচ বহু বছর পার হল হিন্দুধর্মকে নিছক একটি ধর্ম হিসেবে নেওয়া চলে না

তবে হিন্দুধর্মের বহু নেতা সেখানে গিয়েছেন তাঁরাও অসাধারণ কাজ করছেন।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন, বিশ্ব সমাজ ভারত খুব গরীব বলে

জান্ত, আচার-বিচার ও কুসংস্কারের দেশরূপে ভাবত, পেছনে কোন নৈতিক আদর্শ নেই।

জনৈক ইংরেজ বলেছেন, হিন্দুধর্মে কতক ইতর শেনীর দেবদেবী, কাঠ ও পাথরের দানব মিথ্যানীতি

দূর্নীতি পূর্ণ অভ্যাস এবং মিথ্যা কিংবদন্তী ও জাল অনুশাসনযুক্ত পৌত্তলিকতা।

সেই অবস্থা থেকে স্বামিজী পাশ্চাত্যের জনগণের চোখে, সারা পৃথিবীর চোখে ভারতকে

কোথায় তুলে নিয়ে গিয়েছেন এটাই তাঁর মহত্ত্ব ও মাতৃভূমিতে তিনি সেবা দিয়েছেন ইহাই যথার্থ প্রকৃতি।

স্বামিজী শিকাগো বর্ক্তৃতায় যে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তাহাই ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের

অজ্ঞ মানুষদের কাছে সংক্ষেপে অথচ নিপুন বাগ্মিতায় ভারত সত্যকে সংঘটিত করল।

আমেরিকায় অর্থ রোজগার করে গরীবদেরকে সাহায্য স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল (৭৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী যখন বুঝলেন ধর্ম আশ্রয় নিয়েছে ভাতের হাঁড়ীতে, নারীরা সন্তান প্রসবের জন্য

নরকের দ্বার, আবুরোডে স্বামীকে দেখে তুরীয়ানন্দজী মনে ভাবলেন।

স্বামিজীর হৃদয়টি একটি বড় কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে পাক করে একটি প্রতিষেধক

মলম তৈরী হচ্ছে, মলমই তৈরী হলো, স্বামিজী রামকৃষ্ণনন্দজীকে আমেরিকা থেকে এক পত্র লিখলেন।

চিঠিতে লিখেন, একটি বুদ্ধি ঠাওয়ালাম কন্যাকুমারীর শেষ পাথর টুকরাতে বসে

আমরা যে সন্ন্যাসী হয়েছি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে শিক্ষা দিচ্ছি এসব পাগলামি।

খালি পেটে ধর্ম হয়না, গুরুদেব বলতেন না? ঐযে গরীবগুলো পশুরমত জীবন যাপন করছে

তার কারন মূর্খতা, পাজা বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে আর পা দিয়ে চলছে।

আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারায়ে ফেলেছি, সেজন্যেই ভারতে এত দুঃখ কষ্ট

সে জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে, নিচ জাতকে তুলতে হবে।

হিন্দু, মোসলমান ও খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলছে আবার তাদের ওঠাবার যে শক্তি

তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে, তা তাদের দোষ নয়।

আমাদের নিজেদের ভেরত থেকে, আনতে হবে গোঁড়া হিন্দুদেরই একাজ করতে হবে

সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের ধর্মের দোষ নয়।

ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুনই এসব দোষ দেখা যায়, সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই

লোকেরই দোষ, এটা করতে গেলে চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা, পয়সার চেষ্টায় ঘুরতে হবে।

ভারতে পয়সা পাওয়া যাবে না, আমেরিকা এসেছি রোজগার করে দেশে যাব, আর বাকী জীবন

এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ভারতে অবস্থান করে লোক সেবায় নিয়োজিত করব।

আমাদের সমাজের ব্যাধির নাম হিংসা (৭৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

আমাদের হিন্দুদের অস্পর্শতা কিছুটা গেলেও সামাজিক ব্যাধি হিংসা খুব জেগে বসেছে

স্বামিজীর কথায় এতদ্দেশবাসীর মধ্যে হিংসার অভাব আপনার নজরে আসবে।

তিনজন লোক ও পাঁচ মিনিট এক সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে পারিনা আমরা

প্রত্যেকেই ক্ষমতার জন্য কলহ করতে শুরু হয় ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দুরাবস্থায় পড়ে।

হে ভগবান, কখন আমরা হিংসা না করার শিক্ষা লাভ করে সমাজ বা পরিবরের

মধ্যে হিংসা যন্ত্রটী নির্মূল করতে পারব, প্রার্থনা করি ভগবানের চরণে।

বহু পূর্বে এ সমাজ দারিদ্রের হার বেশী সংখ্যক থাকলেও বর্ত্তমান পর্যায়ে তৎবৎ

অতটা নেই বটে তবে, কপটতাও হিংসার দাপটটা এখনও কমে নাই।

যাহা এ ক্ষুদ্র লেখক হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে শেষ জীবন কাটায়ে অদ্যাবধি চলছি

ঈশ্বরের নিকট করুন প্রার্থনা জানাই যেন, এ সমাজ ব্যাধি দূর হউক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধনী কামারিনীর হাতে পৈতা ধারনে সর্ব প্রথম ভিক্ষা গ্রহন করে সমাজে শিক্ষা

দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাধিটির উন্নতির কোন ঔষধ দিয়ে যাননি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ নামায় থাকলেও হিংসা-ব্যাধির কোন প্রতিষেধক নেই

তাই প্রার্থনা আমার সকলের তরে, শিক্ষার আলোকে যেন হিংসা ব্যাধি দূর হয়।

অবশ্য শ্রীমায়ের এ ব্যাপারে দুটি স্থানে স্পষ্ট বিদ্যমান যে, ডাকাত আমজাদকে খাওয়া

নিজে পরিবশেন করা ও নরেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মনের রান্না ঘরে নিয়ে পাশে মা বসে খেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন।

শিকাগোতে স্বামিজী মানুষের স্বরূপ দেবতা বলেছেন (৭৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

শিকাগো বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে ঋষি স্বামিজী যখন বলছিলেন যে অমৃতের সন্তানগণ শোন, দিবালোকের অধিবাসীগণ, আমি যে মহান পুরুষকে জেনেছি, তাঁর আদিত্যের ন্যায় বল, তিনি সকল অজ্ঞান অন্ধকারের পারে, তাঁকে জানলেই মৃত্যু কে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নেই, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান অমৃতের অধিকারী। মর্ত্যভূমির দেবতা, তোমরা অমর আত্মা চির আনন্দময়, শিকাগো বক্তৃতায় যখন উদাত্ত কণ্ঠে উদ্ঘোষণ করছিলেন তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে ধর্মমহা সভায় এক আলোক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল।

সর্ব ধর্মই চিরকাল মানুষকে নরকের ভয় পাপের ভয়, দেখায়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষকে পাপী বলে চিহ্নিত করেছে, পাপের সন্তান বলে প্রচার করেছে ও স্মাত অংশ বহুলাংশে রয়েছে। হিন্দু ধর্মেও তার ব্যতিক্রম নয়, যে লৌকিক অংশ, যে পৌরানিক ও স্মতি অংশ সেখানেও ঐ ভাব বহু পরিমানে রয়েছে, কিন্তু বেদান্তে যার নির্যাস, বিধৃত রয়েছে।

সেই বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্মে পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে শুধু সেখানেই একমাত্র ব্যতিক্রম আমরা পাই তথায় বারবার উদ্ঘোষিত হয়েছে মানব মহিমার কথা মানষ হীন, মানুষ দুর্বল নয়।

মানুষ পাপী নয় মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা, অভাবনীয় ঐশ্বর্য, জাতি, বর্ণ, ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে চৈতন্য-শক্তি বিরাজিত রয়েছে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রার্থক্য শুধু সেই চৈতন্য-শক্তির বিকাশের তারতম্য, অধিকাংশ মানুষ তাদের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য সম্পর্কে অবহিত নয়, এই অজ্ঞানতা, যে জ্ঞান একে দূর করার জন্য প্রয়াশ ও তার আচরন স্ব উন্মোচনে সাফল্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের গৌরব স্বামিজী পরবর্ত্তীতে ভারতের মানুষকে মগ্ন চৈতন্য থেকে উদ্ধারের বানী বারংবার শুনায়েছেন।

স্বামিজীর ঋষিকেশ ভ্রমনকালের কিছু অভিজ্ঞতা (৭৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী ঋষিকেশ জঙ্গলে ভ্রমনকালে কিছু সন্ন্যাসীকে বেদপাঠ করতে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন, পরে জেনেছিলেন ঐ সন্ন্যাসীগণ মেথর সম্প্রদায়ের লোক।

বৈরাগ্য, তিতিক্ষা ও জ্ঞানের স্রে তারা উপনীত হয়েছেন দেখে স্বামিজীর মনে হয়েছিল যে অনেক গর্ভিত অভিজাত ব্যক্তিও তাঁদের পদতলে বসে আনন্দের সঙ্গে উপদেশ গ্রহন করতে পারে।

আরেকবার ঋষিকেশে সর্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হয়ে দরদর ধারায় রক্ত ঝড়ছে, উলঙ্গ অবস্থায় এক লোককে কতক অল্পবয়সী ছেলে পেছনে দৌঁড়াচ্ছে, ঢিল ছুড়ছে, উলটে তিনি হেসেই খুন।

তাঁকে ধরে নিয়ে স্বামিজী ঐ লোকের ক্ষতস্থান ধুয়ে ন্যাকড়া পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগায়ে দেন লোকটি বলছে- কেয়া মজাদার খেল হ্যায়, বিলকুল বাবা কা খেলা।

কেয়া আনন্দ ! এত রক্তা রক্তিতে ঈশ্বরের লীলার আস্বাদ, তিনি পাচ্ছেন, আবার স্বামিজী শুনেছেন এক সাধুকে বাঘে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে, আর সাধুটি মুখে শিব হহম শিব হহম করছে ধ্বনি।

জনৈক সাধুর কথা স্বাজিমী শুনেছেন, বা দেখেছেন এক কুষ্ঠরোগীর আঙ্গুল থেকে কীট পরে গেলে তিনি আবার কীটটি উঠায়ে ক্ষত স্থানে স্থাপন করে বললেন, খাও, ভাই খাও।

ঐ পরিক্রমাকালে স্বামিজী শুনেছিলেন একবীর মহাত্মার কথা, সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিধর্মীরা যাঁর বুকে ছুরিকাঘাত করেছিল, আর যখন আততায়ীকে তাঁর কাছে ধরে আনল, তখন দীর্ঘকালের মৌণ ভঙ্গ করে তাঁর হত্যাকারীর দিকে তাকিয়ে তাঁর জীবনের শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করে বলছিলেনঃ তত্ত্ব মসি- তুমিই তিনি আমার প্রভু।

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমায় মৈনাক পর্বতে আদিনাথ ও শিব শক্তি অষ্টভূজা স্থাপিত (৮০)

শ্রী অনিল মোহন কর

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী মেষা মৈনাক পর্বতের উঁচু চুড়ায় আদিনাথ শিব তথা মহেশ নামক দেবতা ত্রেতাযুগে গোড়াপত্তন হয়ে আসছে।

সমুদ্রের পরিবেশে অবস্থিত আদিনাথ নামে খ্যাত হয়ে হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ রামায়ন, পুরান ও ঐতিহাসিক বর্ননায় শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়ে সাগর পাড়ের মন্দিরে পূজিত হয়।

আদিনাথ দর্শন সম্বন্ধে এমন লেখাও জনশ্রুতি আছে যে, যাঁহা দর্শন না হলে অন্য তীর্থ দর্শন সফলকাম হয় না, অর্থাৎ তীর্থের মোক্ষ লাভ ও মনস্কামনা পূরনের আদিনাথ দর্শনই শ্রেষ্ঠ।

ত্রেতাযুগে রাবনের আরাধনায় দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে শিবলিঙ্গ কৈলাশ থেকে বহন করে লঙ্কায় নিয়ে যাবার বর পেলেন, তবে পথিমধ্যে কোথাও রাখা হলে মহাদেব সে স্থানেই অবস্থান নেবেন।

শিব শঙ্করের প্রদেয় সত্বানুযায়ী রাবন রাজী হয়ে লিঙ্গটি কাঁধে বহন করে মৈনাক পর্বতে আমলে নারায়ন বা গনেশ ব্রাহ্মন বেশে ঐ মৈনাক পর্বতে হাজির হলেন।

রাবন ঐ ব্রাহ্মন রূপী ব্যক্তির নিকট মাটিতে না রাখা সর্ত্তে শিবলিঙ্গটি হাত দিয়ে প্রকৃতির কাজ সারতে গেলে কয়েক ঘন্টায়ও প্রকৃতির কাজ সারতে না পারায় ছদ্ম বেশী ব্রাহ্মন লিঙ্গটি মাটিতে রেখে যান।

যে জায়গায় শীলারূপী মহাদেবকে রাখা হয়েছিল সেটির নাম মুদির ছড়া, বর্ত্তমান মন্দিরের পেছন দিকে, রাবন এসে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হলে দেববাণী হল রাবন তোমার অমর ব্যর্থ হল।

তবে তুমি লঙ্কায় চলে যাও, মৈনাকেই শিব ঠাকুর অবস্থান নিলেন, রাবন লঙ্কায় গিয়ে রামের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাজয় বরন করল এবং রামচন্দ্র সীতাদেবীকে উদ্ধার করলেন।

আদিনাথের অবস্থান নেওয়ার পর এক শ্রুতিতে জানা যায় সেখানকার এক মুসলিমের নাম নূর মোহাম্মদ শিকদার, তার একটি গাভী হঠাৎ দধ দেওয়া বন্ধ করে দিলে রাখালকে সন্দেহ করা হয়।

মনিবের গালমন্দে অতিষ্ট হয়ে রাখাল গাভীটিকে পাহাড়া দিতে থাকে হঠাৎ রাখাল দেখে গাভীটি গোয়াল ঘর থেকে বের হয়ে গভীর রাতে মৈনাক পর্বতে এসে লিঙ্গের উপরে দাঁড়ালে দুধ পড়তে থাকে।

রাখাল স্বচোখে প্রত্যক্ষ করে মালিককে তথ্যটি জানালে গাভীটি অন্যত্র নিয়ে রাখেন কিন্তু গৃহকর্ত্তা স্বপ্নে দেখেন গাভীটি লোহায় শেকলে রাখা হলেও দুধ দেওয়া বন্ধ হবে না।

গৃহকর্ত্তা আরও স্বপ্নে দেখেন যে ঘটনাটি হিন্দু জমিদারকে জানাবার জন্য, ইতিমধ্যে ঐ রাখাল ছেলেটি ঐ কালো পাথরটিতে এক খানা ছোড়াতে ধার দিতে থাকায় অজ্ঞান হয়ে মৃত্যবরন করেন।

আবার মোঃ শিখদার শিবের অষ্টভূজা শক্তিকে নেপাল হতে এনে মৈনাক শিখরে লাগা সন্ন্যাসীর মাধ্যমে ১৬১২ সালে নেপাল শেঠের মন্দির হতে চুরি করে আনার আদেশ পান।

চুরি করে আনার পথে ধরা পড়ে গেলে বন্ধি হয়ে আছেন, রায় ঘোষনার পূর্ব রাত্রিতে নাগা সন্ন্যাসী যোগমায়া বলে মহাদেবের সান্নিধ্যে অভয় বানী পান যে, বিচারক তোমায় যে প্রশ্নই করুক তুমি জবাব দিবে।

তুমি নির্ভয়ে সব প্রশ্নের জবাব দিবে, মহামান্য হাকিম নেপাল রাজাকে প্রশ্ন করে মূর্ত্তির রং জানতে পান, রাজা জবাবে কষ্টি পাথরের মত, নাগা সন্ন্যাসী জবাবে বলেন তাঁর মূর্ত্তির রং সাদা।

বিচারক প্রত্যেকের সম্মখে উন্মোচন করলে দেখেন মূর্ত্তির রং সাদা, তাই সন্ন্যাসীর পক্ষে রায় ঘোষনা হলে নেপালের রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করে আসল ঘটনা জানতে চাইলেন।

নাগা সন্ন্যাসী বিস্তারিত খুলে বললে ঐ রাজাই মূত্তিটী যথাযথ মর্যাদায় আদিনাথ ধামে মৈনাক পর্বতে আদিনাথের পাশেই স্থাপিত করে মূল মন্দির নির্মান করেছেন যাহা অদ্যাবধি পূজিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে কেঁদেছিলেন (৮১)

শ্রী অনিল মোহন কর

ভালবাসার একটি বিন্দু, স্বার্থ নেই কোন চাহিদা নেই, অমৃতের একটি ঘন বিন্দু

শীতকালের উত্তরের বারান্দা, উত্তরের হাওয়া নির্বানের জন্য চিক দিয়ে ঘেড়া।

দক্ষিণেশ্বরের অদ্ভুত সাধক প্রবর নরেনের হাত ধরে টানতে টানতে সেই বারান্দায়

নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে জায়গাটি সম্পূর্ন নিভৃত হয়ে গেল।

সন্ধান ও সন্ধিৎসু, জ্ঞান ও জ্ঞাতা মুখামুখি দুজন বারান্দায় ওপাশে রয়েছে নহবত

শীতের রিক্তপত্র উদ্যান, ক্ষীণ স্রোতা গঙ্গা, এ নিরালা নির্জনে বসে কিছু উপদেশ পাবে নরেনকে ভাবেন।

তখন নরেনের ঊনিশ বছর বয়স হঠাৎ দেখেন নরেনের হাত ধরে দরদরিতভাবে আনন্দাশ্রু

পূর্ব পরিচিতির ন্যায় পরম স্নেহে শ্রীঠাকুর বলেন, এত দেরীতে আসতে হয়।

আমি যে তোর প্রতিক্ষায় অধীর হয়ে আছি তা কি একবারও ভাবতে নেই, বিষয়ী লোকের

বাজে প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে আমার কান যে ঝলসে গেল, প্রাণের কথা না বলতে পেরে পেট ফুলে গেছে।

রবি ঠাকুরের মায়ার খোলায়- প্রমদা যেমন সখীদের বলছেন ঃ-

“আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল

শুধাইলে না কেহ।

সে তো এলোনা, যারে সফিলাম

এই প্রাণ মন দেহ”।

পরক্ষনেই আবার নরেনের সম্মুখে এসে কর জোড়ে দন্ডায়মান হয়ে দেবতার মতো তাঁর প্রতি সম্মান

প্রদর্শন পূর্বক বলতে লাগেন জানি আমি, প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি নররূপী নারায়ন।

জীবের দূর্গতি নিবারনে আবার শরীর ধারন করেছ অদ্ভুত এক নিবেদন, আমার সামনে দাঁড়ায়ে তুমি

নিজেকে চেন, তোমরা সকলে দেখ, দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোক নরেনের চোখ জ্বল জ্বল করছে।

এ যে এক নূতন আবিষ্কার, শাস্ত্র কী বলেছেন প্রকৃত গুরুর কাজ কি প্রস্রবণকে উসকে দেওয়া

খুব সতর্কতায় নিপুন হাতে মায়ার ছানিটাকে তুলে নিয়ে আলো জ্বালা।

সোনার মোহর মাটির তলায় মাটি লেগে আছে ঘষে ঘষে পরিস্কার করা বিশ্বাসের বালি কাগজ দিয়ে

ঠাকুর শেষে বলছেন ঃ “ বাঃ সব মিলে যাচ্ছে, এ ধ্যান সিদ্ধ, জন্ম থেকেই ধ্যান সিদ্ধ”।

যবন হরিদাশের শিশুকাল (৮২)

শ্রী অনিল মোহন কর

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হরিদাশ মূলতঃ ব্রাহ্মন সন্তান শিশু কালে মাতাপিতার মৃত্যুতে অনাথ হলে এক মুসলমান লোক লালন পালন করার পর থেকেই যবন হরিদাস নাম।

দুবেলা দুমুটো অন্নের পরিবর্ত্তে গৃহস্থালীর কাজ আর সোনাই নদীর ধারে মাঠে গরু চরানো হলে, হরিদাসের কাজ, সকালে পান্তা খেয়ে গরু নিয়ে মাঠে ঘাস খাওয়ানো কাজ।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে হিসেব করে গরুগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গোয়াল ঘরে খড়খুটা দিয়ে তার ছুটি গ্রীষ্মের রোদে খোলা হাওয়ায় আবার পরদিন গরু নদীর তীরে মাঠে দিয়ে গাছতলায় বসে থাকে।

এমন কি গরু চরিয়ে আর ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে হরিদাসের দিন চলতে থাকে, সন্ধ্যায় পাশে বামুন বাড়ীতে পাঠ হয়ে থাকে, পাঠক ঠাকুরের মধুর সুরের পাঠ শুনতে আনন্দের সাথে যান।

তন্ময় চিত্তে হরিদাস কথক ঠাকুরের পাঠ শুনতেন এ সময় তাঁর সর্বইন্দ্রিয় শ্রবনইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একান্ত হয়ে যেত, ভগবান ভক্তের দাস, কেবল ভক্তি দিয়ে তাঁকে ডাকলে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

প্রান খুলে ডাকলেই তিনি সাড়াদেন তিনি ভক্তের ভগবান শুধু নাম করা নামেই ভক্তি, নামেই মুক্তি, নামেই মঙ্গল, নামেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

একবার মাত্র কৃষ্ণ নামে যত পাপ মুক্ত হয় একজন ঘোরপাপী একটি জীবনে এত পাপ করতে পারে না, যে কোন বস্তু হতেও নাম বড়, কৃষ্ণ হতেও বড় কৃষ্ণ নাম।

যে যুগে যে অবতার আসেন যে ভাব প্রচার করেন, সে ভাবেই সাধারণ মানুষ তাতে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান ভাব নেওয়া সমীচীন বলে উচিত, কারন দৃশ্যমান ভাবনাতে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ভক্তাধীন ভগবান রাখে কৃষ্ণ মারে কে? (৮৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

যবন হরিদাস পাঠক ঠাকুরের মুখ থেকে নাম কীর্ত্তনের মহিমা শুনে হরিদাসের মন প্রান অপূর্ব এক পুলকের জোয়ার বইছে আর ভাবেন আমিও ডাকলে তাঁর সাড়া পেতে পারি। আমার তো কেউ নেই, আমার সংসারও নেই তাই আমার মনটাতো অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ চরনে উৎসর্গ করে দিতে পারি, হরিদাস মন স্থির করেন, এক গভীর রাতে বুঢ়ন গ্রাম পরিত্যাগ করেন। এরপর হরিদাসের পরিচয় পাওয়া যায় যশোর জেলার বেনাপোলে গভীর জঙ্গলে নির্জন পরিবেশে বনের গাছ পাতায় এক পূর্ণ কঠির তৈরী করে গলায় তুলসীর মালা ও মাথা ন্যাড়া করেন। কুঠিরের সামনে একটি তুলসী গাছ রোপন করে প্রতি মাসে এককোটি নাম জপ করার প্রতিজ্ঞা করে সকালে ঘুম থেকে উঠে তুলসী মঞ্চে জল দিয়ে তিনি জপে বসেন। তিন লক্ষ নাম জপ পূর্ণ হলে উঠে কোন ব্রাহ্মন বাড়ী থেকে সামান্য খাওয়া ভিক্ষা এনে খেয়ে জপে বসেন, কোন দিন তুলষী পাতা খেয়ে ও ক্ষুদা নিবৃত্ত করে নির্জনে বসে হরিদাস ভজনা করেন। এ খবর চারিদিকে ছড়ায়ে পড়লে হরিদাস মুসলমান জেনেও তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা প্রনাম করে কেউ বা এসে পাশে বসে নাম কীর্ত্তনে যোগদেয়, এভাবে গাঁয়ের লোক সকলেই হরিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হন। এদিকে বনগ্রাম আঞ্চলের জমিদার রামচন্দ্র খান বৈষ্ণব-বিরোধী পাষন্ড প্রধান হরিদাসের সুখ্যাতির কথা শুনে রাগে অগ্নিশির্মা হলে ভন্ডটাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার কৌশল করেন। কীর্ত্তন শুনে সবাই বাড়ী ফিরে গেলে ঠাকুর হরিদাস একলা কুঠিরে মহাযোগীর মত আসনে বসে নাম জপ করলে ষড়যন্ত্রকারীরা পর্ণ কুঠিরে আগুন লাগাবার অভিপ্রায়ে এসে দেখে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। প্রচন্ড বেগে বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ী ফিরে দেখে সন্ত্রাসীদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে তছনছ পাকা পোক্ত বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে অথচ হরিদাসের পর্ণ কুঠিরের কিছু হল না । এ হল বিধাতার খেলা, যারা বিধাতার সাধক বিধাতাই, শতবাঁধা বিপত্তি থেকে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করে থাকেন, যাহা চির সত্য তাহাই ঠিক, রাখে কৃষ্ণ মারে কে।

জমিদার রামচন্দ্র খান হরিদাসের পর্ণ কুঠির পুড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে গনিকা প্রেরণ(৮৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

জমিদার রামচন্দ্র খান হরিদাসকে গ্রাম ছাড়া করার নূতন ফন্দি আঁটতে সেখানকার শ্রেষ্ঠা গনিকা তুলসীকে নিয়োগ করল যেমনি তলমল যৌবন আগুনের মত রূপক ঝলক।

বারাঙ্গার চোখে ঝিলিক মেরে উঠা কামের অগ্নি শিখা, টাকার বিনিময়ে নিয়োগ করা গনিকা গনিকা তুলসী অভিসারিকার বেশে, রাতে কীর্ত্তণ শেষে ঠাকুর হরিদাসের কুঠিরে এসে বসে।

হরিদাস একমনে, ভ্রূক্ষেপ না করে বাহ্যজ্ঞান শুন্য অবস্থায় নাম জপ করে চলছেন, টের পাননি ধর্মনাশের তুলসী তাহার দেহের বিশেষ অঙ্গ নিরাভরন করে কামুক বচনে বলল ঠাকুর।

হরিদাস চোখ মেলে তাকায়ে অত্যন্ত বিনয়ের স্বরে বলল পূর্ণ সংখ্যা পূরন না করে আমি কথা বলি না বসে কীর্ত্তন শুন ততক্ষনে আমি সংখ্যা পূর্ণ করি, তারপর তোমার কথা শুনব।

ছলনাময়ী তুলসী-হরিদাসের ছলনা বুঝতে পারল না, বসতে বসতে রাত শেষ, পূর্ব আকাশে লাল আভা প্রকাশ হচ্ছে, তুলসী চমকে উঠে বের হয়ে জমিদারের কাছে গেলে জমিদার রেগে গেলেন।

তুলসী জবাবে আজ হল না, কাল নিশ্চয়ই হবে ঠাকুরের নাম জপ শেষ হয়নি, কাল অবশ্যই হবে কাল আবার সুসজ্জিত হয়ে হরিদাসের কুঠিরে আবার পৌঁছা মাত্র কাল কষ্ট হয়েছে, হরিদাস বলল।

সে রাতেও নাম শেষ হয়নি বলে কোন কার্য্য সমাধা না হলে তৃতীয় রাতেও গভীর রাতে পর্ন কুঠির আগমন আবার সে রাতে বসে নাম শুনতে শুনতে জমিদারের শাস্তির কথা না ভেবে পাপাসক্ত তুলসী মাঝে মধ্যে হরি হরি করে।

তুলসীর মনে হলো কে যেন কানে অনবরত অমৃত সুধা বর্ষন করে চলছে, হঠাৎ হরিদাসের চরনে গনিকা পতিত হয়ে রোদন করতে করতে ঠাকুর আমায় ক্ষমা করো, আমি পাপী ও জমিদারের কথায় এসেছি।

হরিদাস তাকে ছুয়ে বলেন, কান্নায় তোমার পাপ ধুয়ে গেছে, নাম কর তুলসী পাতা খাবে, হরিনাম কর রূপগর্ভিনী বিলাসিনী বারাঙ্গনা তুলসী নামের প্রভাবে বৈষ্ণবী হয়ে কৃষ্ণাপ্রিয়া নামে পরিচিত হলো।

সমাজে সকলের চিত্তশুদ্ধি হওয়া উচিত (৮৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

ভগবানের নাম শুনে মনে অনুরাগ উপস্থিত হলে, তাকে ভক্তি বলে, ভক্তির লক্ষন নানা রকম

মতভেদে নানা প্রকার, ভগবৎ পূজাদিতে অনুরাগের নামই হল ভক্তি।

ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম বিতান হতে নিবৃত্ত করবার জন্য বিধি পূর্বক পূজাদি প্রয়োজন অতীব,

পূজা করতে করতে প্রেমের উদয় হয়, শ্রদ্ধা পূর্বক ভগবান সেবা করলে অন্ঃকরন শুদ্ধ হয়।

চিত্ত শুদ্ধ হলেই নির্মলা ভক্তির উদয় হয় তাই সুযোগ পেলেই, অনুষ্ঠানাদি করা আবশ্যক

ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন, ভগবৎ কথা শ্রবন ও পূজাদি করা উচিত।

নিজের সামর্থ না থাকলে ঐ সমস্ অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করা উচিত, যাতে দেহ মন পবিত্র হয়

ঈশ্বরের প্রীতিকর কোনো উপায় সাধনের অনুষ্ঠাতাই প্রকৃত ভক্ত ঈশ্বর শক্তিতে বলবান।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপড়ে অর্চ্চনায় যে ফল হতো কলিযুগে কেবল মাত্র

নাম সঙ্কীর্ত্তন করলেই সেই ফল বা ভগবৎ কৃপা লাভ করা যায়।

যার যে ইষ্টদেব, সেভাবের কীর্ত্তনাদি পরিবেশিত হলেও ঐ নামের রয়েছেন আমার ইষ্টদেবতা

তাই ঈশ্বরের যেমন অনন্ নাম ভাবও অনন্, আমার ইষ্টদেবই তো ঐ নামে রয়েছেন।

সে জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের “যত মত তত পথ” ঐ রাস্টি তো শ্রীঠাকুরই রচনা করে

কেউকে এক ঘরে করে রাখেননি, এযুগে তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলেরই নিকট নন্দিত।

মনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভ্ত করার একমাত্র মহোষধি শ্রীঠাকর এযুগের সকলের জন্য

রেখে গেছেন বলেই শ্রীঠাকুরের অনুসারীগণ কোন সম্প্রদায়কে হেয় করেন না।

রাজা দশরথের ছেলে পরজন্মে চন্ডাল হয়ে জন্ম (৮৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

মানব জীবনে যত কিছু পূজাপার্বন ও ভজনা যতই কিছু হয়না কেন আসল শক্তি ভক্তি,

ভক্তি না থাকলে শত পূজা বা ভজনাতে ফল লাভের আশা করা যায় না।

এলেখায় কিছু কথার অবতারনা করা হল ভক্তগণ অনুগ্রহ করে দুচারটি কথা

ধীরভাবে ধর্মের বিশ্বাস যদি অনুভব করা না হয় সর্ব ধর্ম করা বৃথা।

যেমন একবার সত্যবামা ব্রতের দক্ষিনা দান স্বরূপ নারদ কৃষ্ণকে, দান করলে

যাবার সময় কষ্ণ নিয়ে যেতে উদ্যত হলে মহিষীগণ আর্তনাদ করতে শুরু কৃষ্ণকে ছাড়তে নারাজ।

তাঁর বদলে অন্য কিছু দিতে রাজী, নারদ বলেন কৃষ্ণের ওজনে ধনরত্ন দিলে কৃষ্ণ না দিলে চলবে

তাই পাল্লায় একদিকে কৃষ্ণ অন্যদিকে দ্বারকার সমস্ ধনরত্ন পাল্লায় দিলেও পাল্লা উঠল না।

তখন উদ্ধব এসে সমস্ ধনরত্ন নামিয়ে তুলসী পাতায় কৃষ্ণ নাম লিখে দিলে পাল্লা নীচে নেমে গেল

তাই সকল ভক্তবৃন্দ নামের মহিমার কথা একবার ভেবে দেখেন মনে মনে।

নামের মহিমার বিরাটত্ব কি হতে পারে সকল দীক্ষার প্রাপ্ত নাম ভক্তবৃন্দ ভেবে দেখুন

কি মূল্যবান জিনিস নিয়ে আমরা চলি ধারনা করুন সকলেরই দীক্ষার প্রাপ্ত নামের গুন।

রাজা দশরথ যখন ভুলে অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করে গুরু বশিষ্ট মুনির কাছে বিধান চাইতে আসল

তখন মুনিবর আশ্রমে না থাকায় তাঁর ছেলে তিন বার রাম নাম জপ করলে পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে ফিরে এ বিধান দিয়েছে শুনে তাঁর ছেলেকে অভিসম্পাদ দিলেন যে, পর

জন্মে তুই চন্ডাল হয়ে জন্মাবি, কারন একবার রাম উচ্চারনে সর্বপাপ ক্ষয় হয়, তিনবার কেন?

তাই ভক্তগণ নামের মহিমা বা গুনাগুন ধারনা করা প্রয়োজন, আমরা সকলেই,

কারন এত বড় জিনিস দীক্ষায় প্রাপ্ত হয়েও তাঁর মর্ম আমরা অনুভব করতে পারি না।

নবদ্বীপে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের মিলন ও হরিদাসের ভজন গোফায় বিষধর সর্প (৮৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

বীরভূম জেলার মল্লারপুর রেলষ্টেশানের নিকটে প্রাচীনকালে একচক্রা নামে একগ্রাম ছিল মহাভারতে উল্লেখ আছে বনবাসকালে পান্ডবগণ কিছুদিন বাসকরে রাক্ষসগণকে সংহার করেন।

সেই গ্রামের লোকেরা সকলেই ধার্মিক ও গুনবান ছিলেন, সেই গ্রামে মুকুন্দরাম নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মন ছিলেন, তাঁর সহসঙ্গিনীও ছিলেন পরম পবিত্র ১৩৩৫ শতকের মাঘমাসে তাঁদের ঘরে নিত্যানন্দ জন্মেন।

পিতা মুকুন্দ পন্ডিত মাতা পদ্মাবতী ঘরে শ্রীনিতাই জন্মে বালক বয়স থেকেই সন্ন্যাসীদের আহ্বানে গৃহ ত্যাগ করে এক সন্ন্যাসীর সাথে নানা তীর্থ ক্ষেত্রে ঘুরে শ্রীক্ষেত্রে এমে উপস্থিত হন।

সেখানে মাথবেন্দ্র পূরীর সাক্ষাৎ লাভ করে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, সেখানে কৃষ্ণাবেশে সর্বদা বিভোর থাকেন, লোকমুখে জানতে পারেন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রকট হয়েছেন।

কাল বিলম্ব না করে নিত্যানন্দ প্রভূ নবদ্বীপ শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে উঠেন, সেখানেই মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হল উভয়ের, এদিকে হরিদাসও অদ্বৈত আচার্য্যের সাক্ষাৎ হলো।

হরিদাস তাঁর শান্ গোফায় নির্জনে হরিনাম জপ করেন, আর দু'বেলা শ্রীঅদ্বৈতের ঘরে অন্ন গ্রহন করেন, যে গোফায় হরিদাস হরিনাম ভজন করতেন তার কাছেই এক বিষাক্ত সাপ ছিল।

ভক্তেরা এসে হরিদাসের দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতে সাপের ভয়ে অস্থির, এ কথা হরিদাসকে জানালে, তিনি বলেন আমিতো দেখিনি তা তোমরা সকলে কৃষ্ণনাম কর।

এমন সময় সকলে সবিস্ময়ে দর্শন করল এক বিরাট সাপ মাথায় মনি ঝলমল করছে গর্ত্ত থেকে উঠে অন্যত্র চলে গেল, এ দৃশ্য দেখে সকলেই উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করল।

নবদ্বীপ আসলে নিত্যানন্দের সহিত মহাপ্রভুর সহিত মিলন হল তদুপরি হরিদাসও অদ্বৈত গোঁসাইর সহিত সাক্ষাতের পর নবলীলাক্রমে নবদ্বীপে নাম সঙ্কীর্ত্তণের জোয়ারে ভাসমান হয়ে ভক্তগণ ধন্য হল।

কলিকালের আগমণ বর্ণনা (৮৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

কলিকালে পৃথিবীর অত্যাচারী রাজারা যার দোদন্ড করাল সর্পের কবলে পড়ে বিষের জ্বালায় জ্বালিত বিগ্রহ হয়ে করবাল দন্ডে দন্ডিত হবেন।

যিনি ব্রাহ্মন কুলে জন্ম সিন্ধ দেশের অর্শ্বে আরোহন করে সোনলীরূপে সত্য যুগের সৃষ্টি করবেন, সেই পরমাত্মা ভগবান কল্কি হরিরূপী সকলকে রক্ষা করবেন।

নৈমিষারন্যাবাসী শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিরা সুতের মুখে একথা শুনে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সর্ব ধর্মজ্ঞ ও ত্রিকালদর্শী তাই কোন পুরানই তোমার অবিদিত নয়, তুমি ভাগবত বর্ণনা কর।

কলি কে? কোথা তাঁর জন্ম, কেমন করে তিনি পথিবীর ঈশ্বর হবেন, কি করে সনাতন ধর্মের লোপ করবেন, মুনিদের প্রশ্নের জবাবে শ্রীহরিকে ধ্যান করে বর্ণনা করেন।

জগৎ স্রষ্টা লোক পিতাসহ ব্রহ্মা নিজের পৃষ্টদেশ থেকে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করেন সেই পাতক অধর্মনামে বিখ্যাত অধর্মের রমনীয় প্রিয়ার নাম মিথ্যা, তার চোখ বিড়ালের মত।

তাদের পুত্রের নাম দম্ভ, সে অতি তেজস্বীও কোপন স্বভাবের, ভগ্নি মায়ার গর্ভে তার একটি পত্রও একটি কন্যার জন্ম হয়, তাদের নাম লোভ ও নিষ্কৃতি, এদের ক্রোধ নামক এক পুত্র হয়।

ক্রোধের ভগ্নির নাম হিংসা, কলি এদের পুত্র কলির কান্তি তৈল লিপ্ত কাকের মতো উদর করাল বদন ও লোল জিহ্বা, বাম হাতে তার উপস্থ ধরে আছেন।

এ আকার দেখে ভয় হয়, এর গায়ে পূতিগন্ধ ইতি দ্যুত মদ স্ত্রী ও সোনা আশ্রয় করে থাকে দুরুক্তি তার ভগ্নি তার গর্ভে কলির এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে পুত্রের নাম ভয় কন্যার নাম যাতনা।

এদের অনেক পুত্র জন্মে কলির কুলে বহু ধর্ম নিন্দুকের জন্ম হয়, এরা যজ্ঞ বেদাধ্যযন দান প্রভৃতি ধর্মকায্য লোপ ধর্মশাস্ত্র ধ্বংশ করার কাজে সারাক্ষন যন্বান।

এ অধমেরা সারাক্ষন কুতর্ক করে ও ধর্ম বিক্রয় করে, বেদ বিক্রয়ী, পাপাচারী শঠ ও মঠ নিবাসা বিবাদ কলহই এরা ক্ষুব্ধ থাকে, কেশ বেশ বিন্যাস ও ভূষণ ধারনে এরা ব্যস্ থাকে।

সন্ন্যসীরা গৃহে আসক্ত হবেও গৃহীরা বিবেক শূন্য সবাই গুরু নিন্দা পরায়ন ও ধর্ম চিহ্ন ধারন করে সাধুদের বঞ্চনা করবে, শক্ররা হবে প্রতিগ্রহ পরায়ন, বর কনে রাজী হলেই বিবাহ সম্পন্ন হবে।

উপরে বর্ণিত অবস্থা কলির প্রথমপাদে দ্বিতীয় পাদে ভগবানের নাম বিবর্জিত হবে তৃতীয় পাদে বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি ও চতুর্থ পাদে সবাই একবর্ণ হয়ে ভগবানের সাধনা সবাই ভুলে যাবে।

কল্কির জন্ম বৃত্তান্ত কলির প্রভাবে আত্মরক্ষার্থে অক্ষম (৮৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

পৃথিবী থেকে দেবঅধ্যয়ন স্বাহা স্বধা চৌষট্টি ওঙ্কার প্রভৃতি লুপ্ত হলে দেবতারা অনাহারে কাতর হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তাঁরা ক্ষীন দীন অবস্থায় ব্রহ্মালোকে গেলেন। সেখানে দেখেন বেদধ্বনি নিনাদিত হচ্ছে যজ্ঞের ধূম উঠছে চারদিকে মহর্ষিরা বসে আছেন সুবর্ন বেদীর মধ্যে উজ্জ্বল দক্ষিনাবর্ত অগ্নি, জল ফুল ও যজ্ঞের ধূপ পোতা। ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারা ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কথা ব্রহ্মাকে নিবেদন করলেন দেবতাগণের দুঃখের কথা শুনে ব্রহ্মাসমেৎ গোলকে গিয়ে বিষ্ণুর স্ব করার ইচ্ছা পোষন করলেন। পুন্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু সব শুনে ব্রহ্মাকে বলেন আমি তোমার অনুরোধে শাম্ভল গ্রামে বিষ্ণযশা নামে ব্রাহ্মনের গৃহে সুমতি মায়ের গর্ভে প্রাদভূত হব ও চার ভাই এর সঙ্গে কালক্ষয় করব। তোমরা দেবতারা নিজের নিজের অংশে অবতীর্ণ হয়ে আমার সাথে বন্ধুতা স্থাপন করবে আমার প্রিয়া লক্ষ্মী দেবী সিংহলের বৃহদ্রথের রানী কৌমুদীর কন্যা হয়ে জন্মাবে। তাঁর নাম হবে পদ্মা, তোমরা দেবতারা পৃথিবীতে গিয়ে নিজ নিজ অংশে অবতীর্ন হও আমি আবার মরুও দেবাপি নামের দুরাজাকে পৃথিবী শাসন করার জন্য স্থাপন করব। সপতূল্য কালীকে পিরাকরণ করে পুনরায় সত্য যুগও সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করে বৈকুণ্ঠে ফিরব পরমাত্মা বিষ্ণু, স্বীয় মহিমায় মানুষরূপে শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করবেন। তারপরই বিষ্ণুযশার স্ত্রী সুমতির বৈষ্ণব গর্ভে সঞ্চারিত হব, গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিরা ঐ গর্ভস্থ শিশুর পদাম্বুজের সেবা করতে লাগলেন, জগৎপতি বিষ্ণু জন্ম নিলে দেব ঋষিরা সহর্ষ হলেন। ব্রহ্মা এ কথা শুনে সুরভি-সূর্য-শীতল পবন সবেগে সূতিকাগারে গিয়ে বিষ্ণুকে চর্তুভূজ্য মূর্ত্তি ত্যাগকরে মানুষের আকার দ্বিভূজ ধারণ করলে তাঁরা ভ্রম বলে ভাবলেন। পৃথিবীর পাপ অপপোদনের জন্য বিষ্ণুই নরাকারে অবতার হয়ে এসেছেন জেনে বালকের নাম রাখা হল কল্কি, জাত কর্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করে হৃষ্ট চিত্তে সকলেই ফিরেগেলেন।

অল্প তপস্যা যাঁদের তাঁরা কলির অধিকারে আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা বৈদিক ক্রিয়া বিরত পাপামাত্মা তেজহীন শুদ্রের সেবক কলির প্রভাবে আত্ম রক্ষার্থে সক্ষম নন পিতার এ কথা শুনে কলি কুল ধ্বংশের জন্য গুরু গৃহে যাত্রা করেন।

শ্রীশ্রী কুমারী পূজার তত্ত্বকথা (৯০)

শ্রী অনিল মোহন কর

কুমারী পূজার মাহাত্ম্য যোগিনীতন্ত্রে দেখা যায় যাহা দূর্গাপূজায়, জগদ্ধাত্রী পূজাও কালী পূজা, শ্রীকামাক্ষাদি শক্তি পূজায় অঙ্গরূপে কুমারী পূজা হয়ে থাকে।

যোগিনীতন্ত্রে কুমারী পূজার উপাখ্যানে বলা হয়েছে ব্রহ্মা শাপবশে মহাতেজ্বা বিষ্ণুর দেহে পাপ সঞ্চার হয়েছিল, সর্বজ্ঞ বিষ্ণ ঐ শাপ মোচনে হিমাচল সন্নিধানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।

সেই পাপের ক্ষয়কারী মহাকালী অষ্ঠাক্ষরী মহাবিদ্যার দশ সহস্র বৎসর জপ করে মহাকালীকে সন্তুষ্ট করলে দেবীর সন্তোষ মাত্রই বিষ্ণুর হৃদপদ্ম হতে "কোলা" নামক মহাসুরের আবির্ভাব হয়।

সেই কোলাসুর ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাজিত করে অখিল ভূমন্ডল বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মার কমলাসন ইত্যাদি হরন্ করলে "রক্ষ রক্ষ" বাক্য উক্তি বিনম্রচিত্তে দেবীর স্ব শুরু করেন।

বিষ্ণু আদি দেবগনের স্বে সন্তুষ্টা হয়ে কুমারীরূপ ধারন করে কোলা নগরী গিয়ে কুলাসুরের নিকট গমন করে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করলে দেবীকে অন্তঃপুরে নিয়ে নানাবিধ ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করে।

অল্প সময়ে সমস্ খাদ্য খেয়ে তৃপ্তি হলো না বলে দেবী বললে, কোলাসুর বলে যাতে তোমার তৃপ্তি হয় তাহাই কর, বালারূপী কালী কোলাসুরের বাক্য শুনে তার অশ্ব হস্ত সৈন্য ও কোলাসুরকে ভক্ষন করে।

দেবীর এ অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে দেব গন্ধর্ব কিন্নর-কিন্নরী- দেবপত্নীগণ সকলে সমবেত হয়ে সেই কুমারীর পূজা করেন অনন্তর বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদিও সর্বলোকেই কুমারী পূজায় ব্রতী হল।

সাধারণত অবিবাহিতা যে মেয়ে রজঃ শালা হয়নি সকল জাতিরই কুমারীকে পূজা করা যায় তবে ব্রাহ্মন হলে উত্তম হয়, কুমারী মাত্রই সর্ববিদ্যাস্বরূপা ছয় বছর হতে রজঃশালা না হওয়া পর্যন্ত পূজা করা যায়।

কুমারী পূজা শ্রীদূর্গাপূজার অষ্টমী তিথির পূজার পরে নবমীতে হোমের পর কুমারী পূজা প্রশস্ত হয়

কুমারী পূজার ধ্যান মন্ত্রে কুমারীকে দেবীবুদ্ধিতে পূজায় তুমি কুমারী, জননীও পরমানন্দরূপিনী।

শ্রীচন্ডি গ্রন্থেও কুমারী পূজা স্বীকৃত আছে শ্রীমৎ স্বামী জগদ্বীশ্বরজীর শ্রীচন্ডির ভূমিকায় মাহামায়ার বিশ্বব্যাপিনী হলেও নারী মূর্ত্তিতে তাঁর সমাধক প্রকাশ তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবও মাতৃত্বের প্রাধান্যে কুমারী পূজা শ্রেষ্ঠ বলেন।

যতই কর বাহাদূরী বিচার করবেন সেই বিচারক (৯১)

শ্রী অনিল মোহন কর

তুমি কার ? কে তোমার? কোথা থেকে আসছ তুমি, খোঁজ নেয় কে তোমার ?

একথা গুলো হতে পারে কেবল এ বিশ্বের মানবের তরে।

আমরা এ বিশ্বকে এক সাধারণ গ্রাম গঞ্জে তো সবাই সবাইকে চিনি না

যদি না ঐ ব্যক্তিটি কোন ভালকর্ম বা খারাপ কর্মে লিপ্ত না থাকেন।

এ ভাল বা খারাপ কর্মটিতেই সর্বব্যক্তিই ঐ ভাল বা খারাপকারী লোকটিকে সমাজ

তাকে চিনতে বা জানতে পারবে তার কৃত কর্ম সৎ বা অসৎ কর্ম দিয়ে।

তাই তো শাহ্‌বাগ ঢাকায় কে যে কোথা থেকে শতশত লোকজন এসে মিশছেন

সবাই একই সঙ্গে গান, বাজনা, বক্তৃতা স্লোগানে শামিল হচ্ছেন।

তাঁদের একই সুর স্বর বা একই গানের পদে ধোঁয়া তুলে নেছে গেয়ে

একাত্তরের বেদনাদায়ী মা, বোন, ভাই ও পিতার হত্যাকারীদের বিচার শুরু হল।

দুচার জন ব্যতীত হাজার হাজার মানুষের তো মা বোনকে নিয়ে হায়েনারা তাঁদের

অত্যাচার করেনি বা মারেনি, তারা কেন শামিল হলেন ঐ শাহবাগে।

এহল প্রকৃতির খেলা, আমরা যতই কিছু বাহাদূরী করিনা কেন, ইহাই

সত্য, মানুষ মানুষের জন্যে, সত্যের মৃত্যু নেই, নেই কোন পরিচিতি।

তবুও সত্য বের হয়ে আসবে অলৌকিকভাবে বিচার হবে নিভৃতে বিচারক হবেন সেই

ব্যক্তি যাঁকে প্রেরণ করবেন, যথা সময়ে সেই বিশ্ব স্রষ্টা সঠিক সময়ে।

যাঁরা দেখেননি ১৯৭১ ইং এর পাকিস্নী সৈন্য রাজাকার, আলবদর, আল শামস্‌দের

হায়নাদের অত্যাচার, যারা করে রেখেছিল আমাদের মমতাময়ী মা ও বোনদের উলঙ্গ অবস্থায়।

স্থায়ী স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারনের পরে খেতড়ির মহারাজের সাক্ষাৎ হয় (৯২)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী প্রমদাদাস মিত্র বা বলরাম বসুকে যখন চিঠি লেখেন, তখন পত্রের শেষে নিজকে "দাস নরেন্দ্র" বলে নাম উল্লেখ করেন, তবে গুরু ভাইদের কাছে শুধু "নরেন্দ্র" লিখেন।

বরাহগণ মঠে স্বামিজী যখন বিরজা হোম করে সন্যাস গ্রহন করেন, তখন নাম হয়েছিল স্বামী বিবিদিষানন্দ এ নাম নিয়েই তিনি পরিব্রাজক হয়ে থাকেন।

লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকার জন্য নাম পরিবর্তন করে স্বামী সচ্চিদানন্দ ও সর্বশেষে স্বামী বিবেকানন্দ নামেই শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিজয়ে করেন ও এ নামটিই স্থায়ী হয়।

স্বামিজী হিমালয় ভ্রমণে অভিজ্ঞতা তার গুরু ভাই স্বামী অখন্ডানন্দের সঙ্গে যাবার পূর্বে জননী সারদাদেবীর কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নেবার জন্য বেলড়ের কাছে ঘুষুড়িতে ভাড়া বাড়ীতে যান।

স্বামিজী শ্রীমাকে প্রনাম নিবেদন করে একটি গান শুনান, পরে বলেন "মা" যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফেরা নতুবা এই-ই। মা সচকিতে বলেন "সে কি?"

এমনি স্বাজিমী কথাটা সংশোধন করে বলেন না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব তবে স্বামিজী ও অখন্ডানন্দের এ ভ্রমনের কোন পত্রাদি বা বৃত্তান্ত পাওয়া যায়নি।

১৮৯০ খ্রীঃর ৬ই জুলাইর পর থেকে ১৮৯১ খ্রীঃর ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত রোমাঞ্চকর পরিক্রমার ঘটনা সবই অজ্ঞাত ও অথচ হিমালয়ের বুকে স্বামিজা দেখেছেন শাশ্বত ভারতের এক মহিমান্বিত রূপ।

১৮৯১ খ্রীঃর ৩০ এপ্রিল স্বামিজী রাজস্থানের এক মুসলমান উকিলের বাড়িতে অতিথি হয়ে তাঁদের রান্না করা খাবার খেয়েছিলেন, এ ঘটনা খেতড়ির দেওয়ান জগমোহন শুনে স্বচোখে দেখে যান।

সেই সুবাদেই স্বামিজীর সঙ্গে খেতড়ির মহারাজা অর্জিত সিংহের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়

১৮৯২ খ্রীর বোম্বাই থেকে তাঁর বন্ধু অক্ষয় কুমার ঘোষের চাকুরীর জন্য শ্রীহরিদাস বিহারী দাস দেশাইকে চিঠি লিখে তাঁকে পাঠান।

খেতরী মহারাজের [জয়পুর] প্রাসাদে স্বামিজীর গান পরিবেশন (৯৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

তখনও নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হননি মেঘাবৃত সূর্য্য অনাবৃত হয়নি তখনো

কে জানতো ও ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত ঐ সন্ন্যাসীর দাপ্তী আর মহিমা।

খেতড়ি রাজার উপবনে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর আর্বিভাব সম্ভবতঃ তাঁদের কোতুহলী করছিল

খেতড়ির মহারাজের প্রাসাদে থাকার সময়েই সেখানকার কাঙ্গালীরা স্বামিজীকে জানতে পারেন।

আসলে এ হল সুকৃতি আর অকৃতির রহস্য সৎকথাও সুকৃতি না থাকলে শোনা যায় না

একটি ঘরে ছিকের আড়ালে বসে ঐ জগদ্বিখ্যাত সন্ন্যাসীকে রাজবাড়ীর মহিলারা দর্শন করেন।

কারন সেকালের মেয়েদের বাইরে বের হওয়ার প্রথা ছিল না, বাড়ীর চালাঘর বৈঠকখানা স্বামিজী

গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব চরিতের বিখ্যাত গান পরিবেশন করেছিলেন।

তাহা হল ঃ- জড়াইতে চাই কোথা জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,

ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা সদা ভাবি গো তাই।

স্বামিজীর কণ্ঠও যেমন, ভাবও তেমনি কে না জানে এবং শ্রোতাও শ্রোত্রীরাও

জীবনে সে গানও সে দিনের কথা ভোলেননি, তখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ঠিক ঐ মুহুর্তে জগস্বামা আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে চাইল, সেদিন বোধ হয় ঐ

প্রবাসী মানুষগুলি ও অন্তঃপুরবাসীরাও পরম বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গান শুনছিলেন।

এ গানটিও গিরিশ ঘোষের চৈতন্য লীলার গান “এল কৃষ্ণ এল ঐ, বাঁজল বাঁশরী

রাধা অভিলাশী, ‘রাধা’ বলে বাঁশী ডাকে তোরে ওঠ কিশোরী।

এভাবে আরেকটি গান গেয়ে খেতুরীর মহারাজকে স্বামিজী প্রীত করেছিলেন

গানটীঃ- যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,

আছি নাথ দিবা নিশি আশাপথ নিরখিয়ে।।

স্বামিজী কপর্দকহীন অবস্থায় পনায় ভ্রমণ (৯৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

১৮৯২ খ্রীঃ এর কোন এক সময়ে অর্থাৎ শিকাগো ধর্মসভার আগে পুনা ভিক্টোরিয়া টার্মিনালে ট্রেনে কামরায় স্বামিজীকে কয়েকজন গুজরাটি ভদ্রলোক বিদায় দিতে আসেন। তথায় বালগঙ্গাধর তিলক স্বনামধন্য দেশ প্রেমিক ও জাতীয় জাগরণের অগ্রগন্য নেতার ট্রেনে পরিচয় ঘটে স্বামিজীর ও পুনায় পোঁছলে ঐ নেতার বাড়ীতে আটদিন থাকেন। ঐ নেতা নাম জিজ্ঞাসা করলে জবাবে একজন সন্ন্যাসী মাত্র বলেন, স্বামিজী এখানে কোন বক্তৃতা দেননি, তবে বাড়ীতে অদ্বৈত দর্শণ ও বেদান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা হত। তখন স্বামিজীর সঙ্গে টাকা কড়ি মোটেই ছিলনা কেবল একখানি মৃগচর্ম একটি কমন্ডল দুই এক খানা গেরুয়া বস্ত্র মাত্র সম্বল, ভ্রমনকালে কেউ গন্তব্য পর্যন্ত টিকেট কিনে দিত। তখন হীরাবাগে অবস্থিত ডেকান ক্লাবের সভ্য ছিলেন ঐ নেতা, প্রতি সপ্তাহে অধিবেশন হতো একবার স্বামিজী ঐ রকম সভায় পন্ডিত কোশীনাথ গোবিন্দনাথ দার্শনিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ঐ সভায় আর কারো বক্তৃতা ছিল না কিন্তু স্বামিজী উঠে ইংরেজীতে ঐ বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়ে তাঁর মহিমায় সকলকে মুগ্ধ করেন, এর অল্প পরে পুনা ছেড়ে চলে যান। এর বহুদিন পর একবার ঐ নেতা কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামিজীর সাথে সাক্ষাৎ হলে সাদরে গ্রহন করেন, স্বামিজী রহস্য ছলে অনেক কথা বলেন। স্বামিজী এ কথাও বলেন যে, তিনি যেন মহারাষ্ট্র গিয়ে তাঁর মত অনুরাগ কায্য গ্রহণ করেন দূর দেশে মানুষ যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে স্বদেশে তা পারে না।

স্বামিজীর দেহত্যাগের পর কোলাপুর গ্রন্থমালার ১৯০২ সংখ্যায় শোক প্রবন্ধ (৯৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

ঋষিগণ পৃথিবীর কাজ শেষ হয়ে গেলে এক মুহূর্তও এখানে থাকেন না, তাঁদের আরদ্ধ কাজ শেষ হয়েছে কিনা তা তাঁরাই বলতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দের জীবন শেষে চল্লিশের ঠিক আগে, তাঁর সব কছিু আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যদি তাঁকে কেউ "শঙ্কর দিগ্বিজয়" এর অনুরূপ "বিবেক দিগ্বিজয়" মনে করতে পারেন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিবেকানন্দের দেহাধারে বিশেষ শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন পাশ্চাত্য জাতি সমূহের উদ্বোধনের জন্য, এর দ্বারা বুঝা যায় পৃথিবীতে বিরাট কাজ করতে সমর্থ।

স্বামিজীর সুবিশাল প্রতিভা আমাদের কাজে লাগানো উচিত, প্রথমে নিজের মঙ্গল দৃষ্টি দিয়ে পরে পৃথিবীর মঙ্গলের চেষ্টা, আমরা সামান্য জীব ঋষিদের কাজের বিচারে আমরা সমর্থ নই।

মহাকালই তাহা নির্নয় করতে পারবে এ সবই বিশ্ব নিয়ন্ত্মার হাতে ১৮৯২ সালে স্বামিজী আমাদের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেছিলেন, তখনই তিনি বিখ্যাত বাগ্মী হয়ে দাঁড়ান।

তিনি শ্রোতাদের সামনে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, সেগুলি তাঁদের মনে গেঁথে যেত তিনি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন তা কেউ বুঝতে পারত না।

স্বামিজীর দেহত্যাগের পর মারাটি সাহিত্যিক কোলাপুরের বিজাপুরকর গ্রন্থমালার সম্পাদক ১৯০২ সংখ্যায় যে শোক প্রবন্ধ স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন কোলাপুরের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী।

স্বামিজী কোলাপুর আসলে ঐ রাজার সেক্রেটারী শুনশেন ঐ বিরাট সন্ন্যাসী ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলেন এবং অপূর্ব ব্যক্তিত্ব তাই তিনি স্বামিজীকে খাসবাগে রাখবার ব্যবস্থা করে দেন।

স্বামিজী অনর্গল কথা বলেন, কোন প্রশ্ন করা হলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, পরদিন রাজবাসীয় পরিষদে আমন্ত্রন জানালে সেখানেও একই অভিজ্ঞতা, এর মধ্যে এক জন এক প্রশ্ন করেন।

প্রশ্নটি হলো মাংসাশীরা কি করে ধর্ম বুঝবে? তাতে স্বামিজী ঝলসে উঠে বলেন প্রাচীন ঋষিরা মাংসাহারী উত্তর রাম চরিতে, সকলে নির্বাক, স্বামিজীর জাত কি কেউ প্রশ্ন করতে সাহস করেনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশীশক্তির পূর্নতা না থাকলে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হতো না (৯৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

শাস্ত্রে পূর্নাবতার হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রনামে পাওয়া যায়, প্রথম হল তাঁর নিজেরই মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বানী- অবতার যাঁর কর্মচারী এবার খোদ তিনি এসেছেন।

দ্বিতীয়- তাঁর স্বতঃ প্রকাশিত সর্ব শাস্ত্রজ্ঞতা তৃতীয়- সন্ন্যাস মতের ও পথের সমন্বয় সাধন শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বৈদান্তিক, ব্রাহ্ম প্রতি বিভিন্ন সম্পদ্রায় তাঁর স্বস্ব আদর্শের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।

এমনকি কর্ত্তাভজা, বামাচারী ও নিজ নিজ, বিশ্বাসের আলোকে দেখে তাঁকে নিজেদের ইষ্টজ্ঞানে, ভক্তিযুক্ত হত, তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হয়ে এসেছেন।

সে যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন দিব্য দেহ ধারন করে এসেছিলেন যাহা স্বতঃই ধাতুর স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং দেবদেহের প্রত্যেক পরমানুটিতে চিদানন্দময়ী ব্রহ্ম শক্তি স্পন্দিত হয়ে উঠে।

শ্রীঠাকুরের প্রত্যেক ভাবভঙ্গিতে ছিল অপূর্ব ব্রহ্মানুভূতি ও প্রত্যেক কায্যকলাপে ছিল ইন্দ্রিয়াতীত চিদানন্দ রাজ্যের দিব্য গন্ধামোদ এবং শ্বাশ্বত সত্যলোকের সমুজ্জল জ্যোতি।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় বাহিরের ব্যাপারগুলি দেখলে বুঝা যায় সর্বধর্ম সাধক বা মহাপুরুষ মাত্র তিনি নহেন, ঐশী শক্তির পূর্নতা না থাকলে বিশ্বব্যাপী প্রভাব প্রসারিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

এ বিশ্বব্যাপী প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাবতারের অন্যতম প্রধান প্রেমলীলারূপে আমরা গ্রহণ করতে পারি অসাধারণ সাধক বা মহাপুরুষ নাম ও স্মৃতি কখনও বিশ্বব্যাপী উদ্দীপনা ও উচ্ছাস জাগায়ে তুলতে পারে না।

স্বামিজী ও কেশব চন্দ্র এ ভাবেই শ্রীঠাকুরকে বিশ্বে পরিচিত ও প্রশারিত করেছেন যাহা তাঁদের নিজের নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতেই হয়েছে- এতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামিজী কেরালার ক্র্যাঙ্গানোরের রাজপুত্রের দর্পচূর্ন (৯৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর প্রভাত কাল কেরালার ক্র্যাঙ্গানোরের মন্দির চত্বরে বটবৃক্ষতলে এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, এ দিকে প্রত্যুষে মন্দিরে অর্চ্চনা সেরে বের হয়ে দেখল সবে এক সাধু। সন্ন্যাসীর কমলনয়ন ধীরে উম্মীলিত হয়ে গম্ভীর শান্ত্ম ওম ধ্বনি তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে স্পন্দিত করল পরিপার্শ্বকে, সমাধি থেকে ব্যথিত হয়ে তিনি চারদিকে তাকালেন। আসন থেকে উঠে মহাত্মন মন্দিরদ্বারে গেলেন প্রবেশ করতে মন্দিরের দ্বাররক্ষীরা নিবারন করল বাধা প্রাপ্ত হয়ে কোন বিরক্তি বা ক্রোধ না করে সেখানে দাড়াইয়েই প্রণাম করে আসলেন। মন্দির থেকে বের হলে এক তরুনের দৃষ্টি আকর্ষিত হল সন্ন্যাসীর দিকে, কিছ্ মজা করা হবে যৌবনের চপলতাবশে সে স্থির করে প্রশান্ত্ম মহাসাগরে চড়ই পাখীর পাখা দিয়ে তরঙ্গ তুলতে ব্যর্থ হল। অর্থাৎ তার তীরগুলি একেবারে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, বিদায় নিতেই দৃশ্যপটে আবির্ভূত সেখানকার প্রসাদের দুই রাজপুত্র কচুন্নি থামপুরণ অন্যজন ভট্টথাম পরন। সন্ন্যাসীর সর্ব অঙ্গ নিরক্ষণ করে বিশেষ প্রভাবিত হলেন বটে, তাই নাড়াচাড়া করে দেখতে চাইলেন বস্তুটা কি? সাধু তাঁদের বয়সী তারুন্যের ও পান্ডিত্যের অহঙ্কারে সাধুর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রলুব্ধ হলেন। প্রশ্ন করে সন্ন্যাসীর নাম, ধাম, গোত্র, বয়স জানতে পারলে না, তবে পোষাক ও ভাষায় বুঝলেন উনি কেরালার লোক নন, সাধু বলে তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সন্ন্যাসী ও রাজকুমাদের অনেক প্রসঙ্গে হলেও কোন তর্কে সাধুকে পরাস্ত্ম করা সম্ভব হল না বলে সমায়িকভাবে রনে ভঙ্গদিয়ে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে পুনশ্চ সন্ন্যাসীর সমীপবতর্ত্তী হলেন। এবারও তাঁরা দিশে হারা হয়ে প্রাসাদে ফিরে প্রতিজ্ঞা করেন যে, পরদিন তাঁদের তূনে থাকবে শাস্ত্র বিধির তিয়্নাগ্র এবং অপ্রতিরোধ্য নানা শর, সারারাত্রি ধরে তাঁরা স্মৃতির পৃষ্ঠা উল্টায়ে চলেন যুক্তি সন্ধানের জন্য। এভাবে সন্ন্যাসীকে কোন ভাবেই পরাস্ত্ম করতে না পেরে যে ভাবে মহাদেবের সামনে কামদেবের হস্ত্ম থেকে ধনুঃশর অজান্তে্ম সম্বলিত হয়ে পড়ছিল ঐ ভাবেই রাজকুমারেরা গিয়ে প্রণত হলেন।

(কেরালার সাপ্তাহিক মাতৃভূমি পত্রিকায় ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ ইং বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসী নামে ছাপা হয়)

শ্রীঅমরনাথের আবিষ্কারক একজন মুসলমান (৯৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

অমরনাথের নাম সনাতনধর্মীগণের কাছে তীর্থস্থান আবির্ভূত হয় এক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক, অমরনাথ বলতে আমরা শিব শঙ্করকে বুঝাতে পারি।

শিবের অপার মহিমায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে দেখতে পাই, বিশেষ ভাবে অমরনাথে শিবের মহিমার কথা।

অমরনাথের ইতিহাসে দেখা যায়, এক মুসলিম যখন অমরনাথে জ্বালানী কয়লা কুড়াচ্ছিলেন তখন এক ঐশ্বরিক ব্যক্তি এক বস্ত্মা টাকা বা অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করে তাঁর দরিদ্রতার দূর করে দেন।

বিনিময়ে সন্ত্মন ধর্মীয় লোকদের কাছে তাঁর মহিমা প্রচার করার আদেশ দেন সেই থেকেই ভারতের হিমালয়ে শিবের মহিমা অমরনাথে প্রসারিত হতে লাগল।

সেই শিবঠাকুর বরফে তৈরী হয় যাহা তাঁরই মহিমায় শীতকালে বরফ জমে শিবলিঙ্গ বেড়ে যায়, শীতকাল ছাড়া ছোট অবস্থায় বিরাজমান থাকেন।

বিধির বিধানে বর্ত্তমানে এ স্থানটি পাকিস্ত্মানের অধীনে বিধায় ঐ সরকারী ব্যবস্থায় যেতে হয় পাক-সরকার সহায়তা করায় তীর্থ যাত্রীরা তথায় গিয়ে অমরনাথকে দর্শন করেন।

যাঁদের বদৌলতে অমরনাথ আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের বংশপরাক্রমে তীর্থ যাত্রী ভক্তগণের প্রদেয় দক্ষিণার একটা লভ্যাংশ সেই আদি আবিষ্কারের সংশধরেরা পেয়ে থাকেন।

ইহা শিব মহিমায় মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক আবিষ্কত হয়ে অদ্যাবধি চলে আসছে অমরনাথের মহিমা সবারই জন্য সমপরিমানে সমাদ্রিত হয়ে চলছে ও চলবে।

হিন্দুরা সনাতন ধর্মে অষ্ট প্রকারের বিবাহ প্রচলন রয়েছে (৯৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

ব্রহ্ম বিবাহঃ-

কণ্যাকে সবিশেষ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করে বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রন করে যে বিবাহ হয় তাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

দৈব বিবাহঃ-

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হলে পর যে যজ্ঞে কর্মকর্ত্তা পুরোহিত অলংকৃত কণ্যাদান দৈব বিবাহ বাচ্য দৈবকায্য সিদ্ধির কামনায় এ বিবাহ সম্পাদন হয় বলে দৈব বিবাহ বলে।

আর্য বিবাহঃ-

যজ্ঞাদি সহ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করতঃ বরের নিকট হতে বলীবর্দ এক জোড়া বা দুই জোড়া গ্রহন করে বিধিবৎ কণ্যা দানকে আর্য বিবাহ বলা হয়ে থাকে।

প্রজাপত্য বিবাহঃ-

বর ও কণে উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্মের আচরণ এ প্রতিশ্রুতিতে যথা বিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্বক বরকে কণ্যাদনের মাধ্যমে যে বিবাহ হয়, তাকে প্রজাপত্য বিবাহ বলে।

আসুর বিবাহঃ-

শাস্ত্রমতে নয়, পরন্তু স্বেচ্ছামতে কণ্যার পিত্রাদিকে এবং কণ্যাকে ধন দিয়ে যে কণ্যা গ্রহন করা হয়, তাকে আসুর বিবাহ বলা হয়ে থাকে।

গার্ন্ধব বিবাহঃ-

কণ্যাও বর একে অন্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ যে মিলন হয় তাকে গার্ন্ধব বলে , উহা কাম মূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত হয়ে, পরে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করলে এ বিয়ে সিদ্ধ হয়।

রাক্ষস বিবাহঃ-

কণ্যা পক্ষীয় লোকদের অনিচ্ছায় তাদের কাছ থেকে জোড়পূর্বক প্রয়োজনে হত্যা করিয়াও হরণ করে নিয়ে বিবাহ করা হয় তাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

পৈশাচ বিবাহঃ-

নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহবলা অথবা উন্মত্তা স্ত্রীলোককে নির্জনে বিবাহ করা হলে তাকে পৈশাচিক বিবাহ বলে, এ বিবাহ অতিশয় পাপ জনক ও অধর্মজনীত।

বর্তমানে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় উপরোক্ত বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে শুধমাত্র প্রজাপত্য বিবাহ ব্যবস্থা প্রচিলত আছে, এবং ঐগুলিই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা বলে সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি।

শ্রীশ্রীসারদাময়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপদেশ (১০০)

শ্রী অনিল মোহন কর

নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন বসে ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথা কইলেন, নারদ যখন চলে এলেন, ঠাকুর লক্ষ্মীকে বলেন ওখানে গোবর দাত্ত।

লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলেন, কেন ঠাকুর যে পরমভক্ত তবে কেন এরূপ বলছ, ঠাকুর বলেন নারদ এখনও মন্ত্র হয়নি, মন্ত্র না নিলে দেহ শুদ্ধ হয় না।

জপতপের দ্বারা কর্ম পাশ কেটে যায় কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি চাড়া পাওয়া যায় না রূপ টপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোর প্রভাবে কেটে যায়।

মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না তোমার কাজ তুমি করে যাবে, নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে, বায়ুহীন স্থানে দীপ শিখার মত।

বাতাস থাকলে প্রদীপর শিখা স্থির থাকে না মনেও কল্পনা বাসনা থাকলে মণ স্থির হয় না, ঠিক ঠিক মন্ত্রউচ্চারণ না হলে দেরী হয়।

অন্ত্যতঃ দেহশুদ্ধির জন্যও মন্ত্র দরকার বৈষ্ণবেরা মন্ত্রদিয়ে বলে এখন মন তোর, তাইতো মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।

মন শুদ্ধ না হলে কিছুই হয় না, গুরু, কৃষ্ণ বৈষ্ণব এ তিনের দয়া একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল, একর কিনা মনের, নিজ মনের কৃপা হওয়া চাই।

মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে শাক্তি যায়, গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে, তাইতো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়, গুরু হওয়া বড় কঠিন।

শিষ্যের পাপ নিতে হয়, শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে, ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়, কারও বা হঠাৎ উন্নতি হয়, কারো ক্রমে হয়।

সনাতন ধর্মে শালগ্রাম শিলা সাধারণতঃ চব্বিশ প্রকার (১০১)

শ্রী অনিল মোহন কর

শালগ্রাম শিলা একবার স্পর্শ করলে কোটি বৎসরের জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয়ে যায়

যে শালগ্রামে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এ চারটি চিহ্ন থাকে তাঁর নাম কেশব।

যে শিলাতে পদ্ম, গদা, চক্র, ও শঙ্খের চিহ্ন থাকে তাকে নারায়ন বলে, চক্র, শঙ্খ পদ্ম ও গদা

চিহ্নযুক্ত শিলার নাম মাধব; গদা, পদ্ম. শঙ্খ ও চক্রযুক্ত শালগ্রামকে গোবিন্দ বলে।

যাতে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা চিহ্ন আছে তার নাম বিষ্ণু ; শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রযুক্ত

শিলার নাম মুধুসূদন; গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্মযুক্ত শিলার নাম ত্রিবিক্রম।

চক্র, দগা, পদ্ম ও শঙ্খযুক্ত শিলার নাম বামন; চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদাযুক্ত সাদা চারধার গোলাকার

লিশাকে শ্রীধর ;পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রযুক্ত শালগ্রামকে হৃষীকেশ বলে।

পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খযুক্ত শিলাকে পদ্মনাভ বলে; শঙ্খ, গদা ও পদ্ম যুক্ত শিলাকে

দামোদর বলে; চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মযুক্ত শিলাকে বাসুদেব বলা হয়।

শঙ্ক, পদ্ম, চক্র ও গদা চিহ্নযুক্ত শিলার নাম সঙ্কর্ষণ বলে; শঙ্খ, পদ্ম ও চক্রযুক্ত

শিলার নাম প্রদ্যুন্ন বলে; গদা পদ্ম চক্র লাঞ্চিত শিলার নাম অনিরুদ্ধ।

পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্র বিশিষ্ট শিলার নাম পুরুষোত্তম ; গদা, শঙ্খ ও পদ্ম চিহ্নিত

শিলার নাম অধোক্ষজ; পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী শিলাকে নৃসিংহ বলে।

পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও পদ্মযুক্ত শিলার নাম অচ্যুত ; শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদাযুক্ত

শিলার নাম জনার্দন; গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্কযুক্ত শিলার নাম উপেন্দ্র।

চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খযুক্ত শিলার নাম হরি ; গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ চিহ্নিত

শিলার নাম কৃষ্ণ ; সর্বমোট চব্বিশ রকম শিলা শালগ্রাম পূজিত হয়ে থাকে।

এ শালগ্রাম শীলা বর্ননায় নাম চিহ্নিত করা প্রসঙ্গে শালগ্রামের চিহ্ন সমূহ

একের পর এক অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে প্রতীক বা চিহ্ন হিসেবে গন্য করতে হবে।

স্বামিজীর শ্রীমা ও ত্যাগী নারীদের জন্য আলাদা ও গঙ্গার তীরে মঠ করা (১০২)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী বলেছিলেন যদি তিনি সংসার ত্যাগ না করতেন, তবে তাঁর মহান গুরুদেব শ্রীরাকষ্ণদেরবের বিরাট সত্য এ পথিবীতে হতো না প্রচার। একদিকে ভারত ও বিশ্বের ভাবী-ধর্মসম্বন্ধীয় স্মিজীর পরিকল্পনাও উপেক্ষিত হত যে লক্ষ লক্ষ, নরনারী দিন দিন দুঃখের তমো গহ্বরে যেত ডুবে। যাদের সাহায্য করার বা যাদের বিষয়ে চিন্ত্মা করার কেউ নেই, তাদের জন্য স্বামিজীর সহানভূতি ও ভালবাসাই তাঁর নিকট আত্মীয়দের দূর্গতির হেতুর মধ্যে প্রথমটিই প্রাধান্য পেত। স্বামিজীর সংসার ত্যাগের প্রধান কারন ভারতের দূর্গতদের উপায় অন্বেষণ যাহা তিনি কুন্যাকুমারীকার শেষে শিলায় ধ্যানান্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্বামিজীর জীবনী সমূহে সাধারন ভাবে উপক্ষিত সংসার ত্যাগ কালে তাঁর বিচ্ছেদবেদনা ও গৃহত্যাগ -কালে বুদ্ধের পত্নীত্যাগ প্রসঙ্গে অনেক অসমাপ্ত কাজ রয়েছে। শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রে মাতৃত্যাগের কাজও আছে কাঁদে শচীমাতা নিমাই, প্রতিধ্বনি ফিরে বলে- নাই, নাই, নাই শুনতে পাই আমরা সকলে নিমাই চর্চ্চা করি। কিন্তু স্বামিজীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি যেন সুখ স্বচ্ছন্দে ঘটে গেছে বোঁটা থেকে পাকা আমের খসে পড়ার মতোই যা তাঁর বিবাহ বন্ধন না থাকায় সাহায্য করে। বিবেকানন্দের মাথায় প্রধানতঃ দুটি চিন্ত্মাধারা ঘুরপাক খাচ্ছিল, প্রথমটি হল গঙ্গার তীরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাদি রক্ষাকল্পে স্থায়ী মন্দির করা। অন্যটি হল শ্রীমায়ের জন্য একটি থাকার আস্ত্মানাও করতে হবে যেখানে ত্যাগী মায়েরা সমবেত হয়ে শ্রীমঠের অধীনস্থ স্থায়ীভাবে থাকবে।

স্বামিজী নিজ মুখে মাদ্রাজে বলেছেন আধ্যাত্মিক শক্তির কথা (১০৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

পরিব্রাজ্যকালে স্বামিজীর ব্যক্তিগত সাধনাও উপলব্ধি বিষয়ে সংবাদ অল্পই মিলে

স্বামিজী বিশ্বসংসারের কথা পঞ্চমুখে জাগতিক দুঃখের কথাও বলতে পারেন।

কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্দির কথা বলতে গেলে তাঁর মুখ যেন আটকে যেত ও সব

কথা বড়ই আত্মমর্যাদাহানীকর, অথচ নিরন্ত্বর তাঁর উপলব্দি তরঙ্গে ভাসছেন।

তাঁর বহিঃরূপেও সেই প্রমান অঙ্কিত ছিল, একবার তিনি কথা প্রসঙ্গে বলে ছিলেন নাজারেথের যীশু

হয়েছিলেন গৌতমবুদ্ধ, নদীয়ার নিমাই পন্ডিত-শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

নরেন্দনাথ কি হয়েছিলেন, স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের মধ্যে ওর পঠে স্বামীঅখন্ডানন্দ

অনেক চেষ্টা করে ও গুজরাটের মান্ডরীতে এক ভাটিয়ার বাড়ীতে স্বামিজীর সন্ধান মিলে।

সকলে দেখল, স্বামিজীর আর পূর্বরূপে নেই, তিনি রূপলাবন্যে ঘর আলো করে বসে

আরও কিছুদিন পরে স্বামিজী ভারতের দক্ষিণাংশে মাদ্রাজে আছেন।

অনুরাগী মানুষ, অধিকার সহ যুবক তার চার পাশে যথারীতি জুটেছিন তাঁদের সঙ্গে নানা

সময়ে আলোচনাদি চলছে, এমনই একদিন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বলেছিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টচার্য্যের সমুদ্রতীরে বাড়ী, অপরূপ চন্দ্রলোচিত রাত্রি তথায়

স্বামিজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন, তাঁর মুখ সত্যই প্রদীপ্ত।

সেই সন্ধ্যায় সকলে স্বামিজীর গান শুনেছিলেন স্বামিজী বলেন কখনো কখনো কিভাবে যেন

তাঁর ওপরে শক্তি ভর করে, তাঁর সমাধির অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে।

সেই সময়ে যদি কেউ তাঁকে স্পর্শ করে তার পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়

এ সময় মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সিঙ্গারা ভেলূ স্বামিজীর পায়ে পড়ে অধ্যাপনা ছেড়ে ত্যাগী হয়ে গেলেন।